MONTHLY VANGUARD

ভ্যানগার্ড

www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র
রেজি. নং ডিএ ১৩২৬ : ২২তম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা
ডিসেম্বর-জানুয়ারি ২০২৫
দাম : দশ টাকা

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর শুভেচ্ছা

ভ্যানগার্ড লড়ে জনতার জন্য, ভ্যানগার্ড টিকে আছে জনগণের সহযোগিতায়
৪৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ভ্যানগার্ড পাঠকদের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা

বৈষম্যমুক্তির আকাঙ্ক্ষায় গণ অভ্যুত্থান

এই চেতনাকে শোষণমুক্তির লড়াইয়ে পরিণত করতে হবে

বাসদের ৪৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও মহান রুশ বিপ্লবের ১০৭তম বার্ষিকীতে ঢাকায় সমাবেশ

বাসদের ৪৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ১০৭তম বার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের উদ্যোগে ৮ নভেম্বর ২০২৪ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও লাল পতাকা মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বাসদ নেতৃবৃন্দ বলেন, গত জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার গণ অভ্যুত্থানের চেতনা ছিল গত ১৫ বছরের দুঃশাসনের বিপরীতে একটা গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, সিন্ডিকেট ভাঙা, লুটপাট বন্ধ করা, দেশের পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনা, কালোআইনসমূহ বাতিল, দুর্নীতির অবসান, দখলদারত্ব বন্ধ, জবাবদিহিতা নিশ্চিত, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন।

ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতন হয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নিয়েছে। এখনো নিত্যপণ্যের বাজার দর ঊর্ধ্বমুখী, খাদ্যে মূল্যস্ফীতি সর্বোচ্চ। সিন্ডিকেট বহাল তবিয়তে আছে। জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়নি। চুরি-ছিনতাই, ডাকাতিসহ মব লিঞ্চিং বন্ধ হয়নি। ফ্যাসিস্ট হাসিনা আমলের মতোই মজুরি চাইতে গিয়ে গুলিতে শ্রমিকদের নিহত হতে হচ্ছে, অথচ '২৪-এর গণ অভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতার পাশাপাশি শ্রমিকরা অকাতরে জীবন দিয়েছিল। সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা চালানো হয়েছে, মাজার-আখড়া ভাংচুর করা হয়েছে।

নেতৃবৃন্দ মিরপুরসহ ঢাকার বিভিন্ন স্থানে রিকশা

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

গণ অভ্যুত্থান পরবর্তী অন্তর্বর্তী সরকারের শাসন

বিপুল প্রত্যাশা আর অন্তহীন প্রতীক্ষা

ক্ষমতায় যারা থাকেন তারা সবসময় বলতে পছন্দ করেন যে তারা মানুষের প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করছেন। মানুষ চাইলে তারা থাকবেন না চাইলে থাকবেন না। কিন্তু মানুষ কী চায় তা জানার মাপকাঠি কী? মানুষ কী চায় তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও কী চায় না তা নির্ধারণ করা তুলনামুলকভাবে সহজ। দুঃসময় দীর্ঘস্থায়ী হোক সেটা কোন মানুষ চায় না, আর মানুষের প্রত্যাশা থাকে সুসময়টা দ্রুত আসুক এবং স্থায়ী হোক। সেটা ব্যক্তি জীবনে যেমন, সমাজ জীবনের ক্ষেত্রেও তেমনি। মানুষ বাঁচার চেষ্টা করে একাকী, স্বপ্ন দেখে নিজের মতো করে প্রধানত নিজের জন্য, দুঃখ ভোগ করে একাই, কিন্তু তা সত্ত্বেও দুঃসময়ের মুখোমুখি হলে সহায়তা প্রত্যাশা করে অন্যের কাছে। সহায়তা না পেলে বলে, কেউ কি নেই এই বিপদে আমার পাশে দাঁড়ায়? সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে তেমনি মানুষ ভাবে সমাজে কি প্রতিবাদ করার মতো কেউ নেই? সামাজিক অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে প্রথমেই দলে দলে মানুষ আসে না। অনেকসময় একাকীই দাঁড়াতে হয় প্রতিবাদের পথে। তারপর পাশে এসে দাঁড়ায় একে একে অনেকে। একাকী মানুষ আর্তনাদ করতে পারে কিন্তু একত্র হলেই গড়ে তোলে আন্দোলন। তেমনি এক আন্দোলন দেখেছে মানুষ জুলাই-আগস্টে।

দেখতে দেখতে চার মাস পার হয়ে গেল। ৮ আগস্ট থেকে ৮ ডিসেম্বর। সময়ের দৈর্ঘ্য এক থাকলেও তা কিন্তু সবসময় একরকম অনুভূত হয় না। আনন্দের সময় যেমন দ্রুত চলে যায় প্রতীক্ষার সময় তেমনি যেতেই চায় না আর যন্ত্রণার সময় সন্দেহ জাগে, সময় কী যাবে নাকি এই যন্ত্রণা স্থায়ী হবে? বাংলাদেশের রাজনীতিতে মানুষের ধারণা হয়েছে যে, জনগণের জীবন থেকে

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

উগ্র জাতীয়তাবাদী-আগ্রাসী সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা রুখে দাঁড়ান

অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চেতনায় গণ-ঐক্য গড়ে তুলুন

বাসদ

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে অন্তর্বর্তী সরকারের আহ্বানে সর্বদলীয় মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে অন্তর্বর্তী সরকারের আহ্বানে ৪ ডিসেম্বর রাজনৈতিক দল ও সংগঠনগুলোর যৌথ মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাসদের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ও কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা কমরেড খালেকুজ্জামান। সভায় বাসদের বক্তব্য তুলে ধরেন কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ। অন্তর্বর্তী সরকারের আহ্বানে সর্বদলীয়সভা সম্পর্কে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্নভাবে আলোচনা হচ্ছে এপ্রেক্ষাপটে বাসদের বক্তব্য তুলে ধরা হলো–

ভারতে হিন্দুত্ববাদী বিজেপি তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে উগ্র জাতীয়তাবাদী ও সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা সৃষ্টি করে চলেছে। তাদের অন্যতম লক্ষ্য হলো পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার আগামী নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের মাধ্যমে ক্ষমতায় যাওয়া, যে ক্ষমতা দখল করতে তারা গত দশ বছরে অনেক চেষ্টা করেও সফল হতে পারেনি। একই সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ভারতের অন্যান্য শাসকশ্রেণিভুক্ত দলসমূহ

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

বৈষম্যমুক্তির আকাঙ্ক্ষায় গণ অভ্যুত্থান, এই চেতনাকে শেষণমুক্তির লড়াইয়ে পরিণত করতে হবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জব্দ করে নিলামে বিক্রি ও কাওরান বাজার, গুলিস্তানসহ বিভিন্ন স্থানে হকার উচ্ছেদের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বিকল্প কাজের ব্যবস্থা না করে গণবিরোধী তৎপরতা বন্ধের দাবি জানান। একই সাথে বন্ধ পাটকল-চিনিকল সরকারি উদ্যোগে চালু ও নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করে বেকার সমস্যার সমাধান করার আহ্বান জানান, অন্যথায় বেকার ভাতা চালুর দাবি করেন। সরকারের ১১টি সংস্কার কমিটির এখনো তেমন কোন অগ্রগতি নেই। নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণার ক্ষেত্রে সরকার এখনো স্পষ্ট বক্তব্য দিচ্ছে না। ফলে গণ অভ্যুত্থানের অর্জন দৃশ্যমান হয়নি। জনগণ ধোঁয়াশার মধ্যে রয়েছে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচারের অঙ্গীকার করে ৩০ লাখ মানুষের শহিদি আত্মদান ও ২ লাখ মা-বোনের লাঞ্ছনার বিনিময়ে পাকিস্তানি হানাদার ও তাদের এদেশীয় দোসর সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী শক্তিকে পরাজিত করে দেশ স্বাধীন হলেও গত ৫৩ বছরে বুর্জোয়াশ্রেণির শাসন-শোষণের কারণে দেশে চরম বৈষম্য তৈরি হয়েছে। ক্ষমতার সাথে যুক্ত থেকে মুষ্টিমেয় মানুষ সম্পদের পাহাড় গড়েছে। মেগা প্রকল্পের নামে বিদেশি ঋণের জালে দেশকে বেঁধে ফেলেছে। স্বাধীনতার পর দেশে কোটিপতি ছিল পাঁচ জন, '৭৪ সালে দুর্ভিক্ষের পর কোটিপতির সংখ্যা দাঁড়ালো ৪৭ জন এখন কোটিপতি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১ লাখ ১৮ হাজার ।

৫৩ বছরে সংবিধানে ১৭ বার ছুরি চালিয়ে একের পর এক অগণতান্ত্রিক ধারা যুক্ত করে মানুষের অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে। যারা সম্পদ তৈরি করেন—শ্রমিক-কৃষক, মেহনতি মানুষ তারা শোষণ-বৈষম্যের জাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে। বৈষম্য শুধু অর্থনীতিতে নয়, বৈষম্য আছে—অধিকারে, খাদ্য-বাসস্থানে, শিক্ষা-চিকিৎসায়। বৈষম্য রয়েছে নারী-পুরুষে, ধর্মীয় ক্ষেত্রে। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করে '৯০-এ গণ অভ্যুত্থান হয়েছে। স্বৈরাচার পদত্যাগ করতে বাধ্য হলো। পতিত স্বৈরাচারকে প্রশ্রয় দিল আওয়ামী লীগ। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারীদের প্রশ্রয় দিয়েছে বিএনপি। বুর্জোয়াদের মধ্যে যত বিরোধই থাকুক না কেন ক্ষমতায় থাকা এবং যাওয়ার প্রশ্নে তারা পরাজিত শক্তিকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়।

নেতৃবৃন্দ বলেন, গত ৫৩ বছরে শাসকগোষ্ঠী মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীতে দেশ শাসন করায় মানুষের মুক্তি আসেনি। ২০২৪ সালে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে ছাত্র-শ্রমিক, জনতার অভ্যুত্থানে মুক্তিযুদ্ধের অপূরিত আকাঙ্ক্ষাই আবারও ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে।

নেতৃবৃন্দ নানা বিষয়ে অহেতুক বিতর্কিত বক্তব্য দিয়ে অভ্যুত্থানের শক্তির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি না করে রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে সংস্কারের বিষয়ে আলোচনা করে দ্রুত প্রয়োজনীয় সংস্কার ও নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানান।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর মহামতি লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়াতে দুনিয়ার বুকে প্রথম শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারপর ১৫ বছরের মধ্যে কমরেড স্তালিন ঘোষণা করেছিলেন রাশিয়ায় কোনো বেকার নেই, ভিক্ষুক নেই, পতিতা নেই। ১৯১৭ সালে বিপ্লব সফল করে এক বছরের মাথায় ১৯১৮ সালে নারীদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছে, তখন পর্যন্ত ইউরোপের ডেনমার্ক ও নরওয়ে ছাড়া বিশ্বের কোথাও নারীদের ভোটাধিকার ছিল না। শুধু তাই নয় ১৯৬৩ সালে বিশ্বের প্রথম নারী হিসেবে ভ্যালেন্তিনা তেরেসকোভা মহাকাশ-যাত্রায় পৃথিবীকে প্রায় ৪৮ বার প্রদক্ষিণ করেন এবং তিন দিন মহাকাশে সময় অতিবাহিত করেন।

বিপ্লব সোভিয়েতে নারীর মর্যাদাপূর্ণ জীবন, সর্বজনীন শিক্ষা-গবেষণা, জ্ঞানবিজ্ঞানের অগ্রগতি, শিল্প-সাহিত্য, নাটক-সিনেমা, খেলাধুলায়, সংগীত সর্বক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করেছে। রবীন্দ্রনাথ সেখান সেখান থেকে এসে লিখেছেন—'রাশিয়ায় সেই শিক্ষা কী আশ্চর্য উদ্যোমে সমাজের সর্বত্র ব্যপ্ত হচ্ছে, তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। শিক্ষার পরিমাণ শুধু সংখ্যায় নয়, তার সম্পূর্ণতায়, তার প্রবলতায়। কোনো মানুষই যাতে নিঃসহায় ও নিষ্কর্ম হয়ে না থাকে এ জন্যে কী প্রচুর আয়োজন ও বিপুল উদ্যম।...এরা বন্যার মতো বেগে শিক্ষা বিস্তার করে চলেছে-সায়েন্সের শেষ ফসল পর্যন্ত যাতে তারা পায় এই জন্য প্রয়াসের অন্ত নেই।'

নেতৃবৃন্দ বলেন, আমাদের দেশে শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে মালিকশ্রেণি ও সরকার হাজারো বাধা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে রেখেছে। ভাড়াটিয়া দালাল নেতা, মালিকের পোষা গুন্ডা-মাস্তান লেলিয়ে দিয়ে শ্রমিকের উপর হামলা করে। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নগুলো ধ্বংস করছে, অথচ বিপ্লবের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিকরা ৯০ শতাংশ ট্রেড ইউনিয়নভুক্ত ছিল।

আজ বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ চরম সংকটে নিপতিত। পৃথিবীর সর্বত্রই বুর্জোয়া রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, শাসন-প্রশাসন, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা-চিকিৎসা, কর্মসংস্থান, নিরাপত্তা সবকিছু অবক্ষয়ের পথে চলছে। ফিলিস্তিনে নারী-শিশুসহ অর্ধলক্ষ সাধারণ মানুষকে ইসরায়েল হত্যা করেছে এবং হত্যা অব্যাহত আছে। আর তাদের মদদ দিচ্ছে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদসহ সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব। বুর্জোয়াদের এককালে ছুঁড়ে ফেলা আবর্জনা-জঞ্জালসমূহ যেমন–সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণবাদ, ধর্মান্ধ জঙ্গিবাদ ইত্যাদি ইতিহাসের আস্তাকুঁড় থেকে আবার টেনে আনা–সবই চলছে বেপরোয়াভাবে। মানুষ এসব আবর্জনা থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। এ চাওয়া পূরণের দিশা রুশ বিপ্লবের শিক্ষার মধ্যে রয়েছে। শ্রমিকশ্রেণি ও তাদের পার্টি এবং নেতৃত্বের সঠিক দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের মধ্যে তা সাধিত হবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে উৎপাদনের লক্ষ্য মুনাফা ছিল না, তারা ক্রমাগত উৎপাদন বাড়িয়েছে দেশের মানুষের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক আয়োজন পূরণের জন্য। সেখানে পরিকল্পিত অর্থনীতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন দেশের মোট উৎপাদিত কাঁচামাল, মোট শ্রমিকের সংখ্যা, ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা, উৎপাদন যন্ত্রের পরিমাণ হিসাব করে তারপর পূর্ববর্তী বছরে বা বছরগুলিতে কোন জিনিস কী পরিমাণে তৈরি হয়েছিল, কোন জিনিসের চাহিদা কত, আগামী দিনে সম্ভাব্য চাহিদা কত হতে পারে ইত্যাদির ভিত্তিতে খসড়া পরিকল্পনা করে তার ভিত্তিতে তৈরি করতো মূল পরিকল্পনা। ফলে সেখানো কোনো উৎপাদনের নৈরাজ্য দেখা যায়নি। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে কখনও পরিকল্পিত অর্থনীতি চলতে পারে না, সম্ভবও নয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সম্পদ যা তৈরি হতো তার একটা অংশ শিক্ষা-চিকিৎসা, উৎপাদন যন্ত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি, রাস্তাঘাট তৈরিসহ সরকার চালাবার অন্যান্য বিষয়ে ব্যয় করে বাকিটা জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হতো। এ জন্য সমাজতন্ত্রে কখনও জিনিস বিক্রি না হয়ে পড়ে থাকত না। একইভাবে না খেতে পেয়ে বা বিনা চিকিৎসায় মানুষ মারাও যেত না। বিপ্লবের মাত্র ছয় বছর পর ১৯২৩ সালে শ্রমসময় কমে হয়ে গিয়েছিল দিনে ৭ ঘণ্টা এবং এরপর ১৯৩৭ সালে ৫ ঘণ্টা। ফলে কারখানায় শিফট বাড়ল, কর্মসংস্থান বাড়ল। এভাবেই ১৯৩১-এর মধ্যে বেকার সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান করে ফেলেছিল সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ, '৯০ এর গণ অভ্যুত্থান ও ২০২৪ এর গণ অভ্যুত্থানের চেতনাকে ধারণ করে শোষণ-বৈষম্যহীন সমাজ তথা সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা নির্মাণের সংগ্রামকে বেগবান করা ছাড়া মুক্তির আর কোন পথ নেই। তাই শুধু ক্ষমতার হাত বদল নয় ব্যবস্থা বদলের সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য শ্রমিক, কৃষকসহ আপামর মেহনতি জনতার প্রতি আহ্বান জানান। সমাবেশ শেষে একটি সুসজ্জিত লাল পতাকা মিছিল রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পল্টন মোড়ে এসে শেষ হয়।

বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নিখিল দাস ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড জুলফিকার আলী। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বাসদের প্রতিষ্ঠা আহ্বায়ক ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক বর্তমান উপদেষ্টা কমরেড খালেকুজ্জামান, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড রওশন আরা রুশো।

কুমিল্লা, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, জয়পুরহাট, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, শাহজাদপুর, নাটোর, রংপুর, কুড়িগ্রাম, রৌমারী, গাইবান্ধা, দিনাজপুর, নীলফামারী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, যশোর, খুলনা, মাগুরা, বরিশাল, চাঁদপুর, ফেনী, লক্ষীপুর, চট্টগ্রাম, জামালপুর, গাজীপুর, নারায়গঞ্জ, বগুড়াসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় বাসদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও রুশ বিপ্লববার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনাসভা, সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

ভারতে বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশনে হামলা-ভাংচুর ও জাতীয় পতাকায় অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদ

বাসদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ৩ ডিসেম্বর '২৪ সংবাদপত্রে দেওয়া এক বিবৃতিতে ভারতের কলকাতা, আগরতলা ও বোম্বে বাংলাদেশ হাইকমিশনে হামলা-ভাংচুর ও জাতীয় পতাকায় অগ্নিসংযোগের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির অপতৎপরতা বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, যে কোন দেশে বিদেশি দূতাবাসের সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব সে দেশের রাষ্ট্র ও সরকারের। অথচ ভারত সরকার বাংলাদেশ দূতাবাসের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। উপরন্তু ভারত সরকারের আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতি, শাসক দল বিজেপি ও পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের উসকানিমূলক বক্তব্য এ ধরনের অনভিপ্রেত কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করছে। যা কূটনৈতিক শিষ্টাচার বর্জিত। তিনি বলেন, এ সমস্ত ঘটনায় দুই দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে পুষ্টি জোগালেও ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপদে ফেলছে দুই দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও নিরীহ জনগণকে।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, জনগণের মধ্যে কোন ভুল প্রবণতা তৈরি হলে তা নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব রাষ্ট্র এবং সরকারের। কিন্তু সরকার এবং ক্ষমতাসীন দলের যে কোন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বক্তব্য এবং ভূমিকা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভক্তি এবং বিরোধকে বাড়িয়ে তোলে।

বাংলাদেশে গণ অভ্যুত্থানে ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের পলায়নের পর থেকে ভারতের এক শ্রেণির উগ্রবাদী মহল পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। সৎ প্রতিবেশী সুলভ আচরণের বদলে ভারতের গণমাধ্যমে বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলার বিষয়ে প্রকৃত তথ্যের বদলে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে সাম্প্রদায়িক উসকানিমূলক প্রচার চালিয়ে পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করে তুলছে, যা অনভিপ্রেত।

কমরেড ফিরোজ বলেন, গত কয়েকদিনে ভারত সরকারের বক্তব্য এবং বাংলাদেশ হাই কমিশনে আক্রমণ, পতাকা অবমাননা বাংলাদেশের জনগণকে ক্ষুব্ধ করেছে। অতীতেও সাম্প্রদায়িকতার বিষময় প্রভাব ভারত-বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের জনগণ উপলব্ধি করেছে। সাম্প্রদায়িক শক্তিকে পৃষ্ঠপোষকতা উপমহাদেশকে অশান্তির আগুনে পোড়াবে। বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে সন্দেহ অবিশ্বাস ও তিক্ততা দুই দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও নিপীড়িত জনগণের জীবনকেই বিপন্ন করবে। তিনি বলেন, ভারতের সাথে সম্পর্ক হবে সমমর্যাদার ও বন্ধুত্বপূর্ণ। প্রভুত্বমূলক আচরণ কারও জন্যই ভালো ফল বয়ে আনবে না।

বিবৃতিতে তিনি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরেও যে পরিকল্পিত অসন্তোষ ও অরাজকতা তৈরি করা হচ্ছে তার বিষময় প্রভাব সমাজের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ধ্বংস করবে। সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বন্ধে সরকারের জরুরি উদ্যোগ প্রয়োজন। দেশের প্রধান সমস্যা শোষণ ও বৈষম্য। এর প্রভাবে শ্রমিক-কৃষক, ছাত্র-নারী সকলের জীবন বিপর্যস্ত। ফ্যাসিবাদী শাসন এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করে বাংলাদেশ যখন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সংগ্রাম করছে তখন সাম্প্রদায়িক সংঘাত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করবে, ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে বিপন্ন করবে এবং দেশের জনগণের ঐক্য ও সংহতিকে বিনষ্ট করবে।

তিনি আরও বলেন, দেশের অভ্যন্তরে কিছু উগ্র ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে ধর্মীয় বিভাজনমূলক বক্তব্য, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হামলা এবং ব্যক্তিগত আক্রমণের ঘটনা নিন্দনীয়। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এসব ঘটনা নিয়ন্ত্রণে জরুরিভাবে কঠোর পদক্ষেপ প্রয়োজন। প্রতিটি দেশের পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত এবং নাম সেই দেশের জনগণের গভীর আবেগ ও মর্যাদার বিষয়। এর অবমাননা গর্হিত কাজ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু গত কয়েকদিনে এইসব নিন্দনীয় ঘটনা ঘটে চলেছে। তিনি এইসব কর্মকাণ্ড বন্ধ করার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, কোন দেশের সংখ্যাগুরুর সাম্প্রদায়িকতা সংখ্যালঘুদের আতংকিত ও অসম্মানিত করে, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং সরকার এটা কোনভাবেই বরদাশত করতে পারে না।

অবিলম্বে এই ঘৃণ্য তৎপরতা বন্ধ করার দাবি জানিয়ে তিনি ভারত ও বাংলাদেশের সকল বাম প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ও গণতন্ত্রকামি জনগণকে উভয় দেশের সাম্প্রদায়িক শক্তির উসকানির ফাঁদে পা না দিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করা ও সাম্প্রদায়িক বিরোধ সৃষ্টির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান।

পুঁজিবাদী নিয়ম বহাল রেখে শোষণ-বৈষম্যের অবসান সম্ভব নয়

রংপুরে মতবিনিময়সভায় কমরেড খালেকুজ্জামান

বাসদ রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ২৮ অক্টোবর চেম্বার অব কমার্স ভবনের বোর্ড হল রুমে জনগণের আকাঙ্ক্ষা, 'বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের করণীয়'–শীর্ষক মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় আলোচকদের মতামত শুনে কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধেও ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল—এমন একটা রাষ্ট্র গঠন করা হবে যেখানে থাকবে—সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচার। এর কোনোটাই বাস্তবায়িত হয়নি। স্বাধীনতার পরে ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর অঙ্গীকারনামার বিষয় অর্থাৎ সংবিধান রচিত হলো যা ডিসেম্বরে কার্যকর হয়। সংবিধানের মূল প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে—*আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা–যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে।*

এর মানে হলো, জনগণের ক্ষমতায়নের অর্থে গণতন্ত্র–ভোটের সিলমারা হিসাবের গণতন্ত্র না। গণতান্ত্রিক ও মৌলিক অধিকার প্রাপ্তির নিশ্চয়তায় সকল জনগণ ক্ষমতায়িত হবে এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে একটা গণতান্ত্রিক সরকার থাকবে। সকল বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র হবে, ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার ও ধর্ম বিদ্বেষমুক্ত নিরপেক্ষতা থাকবে, পরে যুক্ত হয়েছিল জাতীয়তাবাদ। বিগত ৫৩ বছরে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা এই দেশে কখনোই প্রতিষ্ঠিত ছিল না। এক দুইবার বিদ্যুৎ ঝিলিকের মতো গণতন্ত্রের আলো মাঝে মধ্যে দেখা গেছে আবার তা বিলীনও হয়ে গেছে। নির্বাচন ছিল, নির্বাচনের ফলাফলও ছিল। কেউ শাসনও করেছেন ৫ বছর, ১০ বছর, ১৫ বছর। কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি ঐতিহ্যগতভাবেই বলি আর একাডেমিক অর্থে বলি এখানে তা ছিল না। '৭২ থেকে ৭৫ সাল পর্যন্ত শাসনামলের কথাটা আসছে। সংবিধানে দশম অনুচ্ছেদে বলা আছে, *মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজ লাভ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।* সমাজতন্ত্রকে সাম্যবাদের লক্ষ্যে বলা হয়েছে। বাস্তবে আওয়ামী লীগ কি সমাজতন্ত্রের পথে দেশ চালিয়েছিল? আওয়ামী লীগ চালু করেছিল সমাজতন্ত্রের সাইনবোর্ড টানিয়ে পুঁজিবাদী মুক্তবাজার এবং ক্ষমতায় বসার কিছুদিনের মধ্যেই তখন দেখা গেল ব্যক্তি মালিকানা প্রধান হওয়ার পথ রচিত হয়ে গেল।

স্বাধীনতার পর ব্যক্তিগত বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা প্রথমে ২৫ লাখ টাকায় বেঁধে দেওয়া হলো। পঁচাত্তর সালের ১৫ আগস্টের আগেই তিন কোটি টাকা সিলিং করা হয়েছিল। তার মানে ধারাটা সমাজতন্ত্রের ছিল না। এরপরে রক্তাক্ত সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে খন্দকার মোশতাক এটাকে ১০ কোটি টাকায় নিয়ে গিয়েছে। ১৯৭৮ সালে জিয়াউর রহমান শাসনামলে প্রণীত *শিল্প বিনিয়োগ নীতি*তে ব্যক্তি উদ্‌যোগে বিনিয়োগের সিলিং বিলোপ করা হলো।

তা হলে স্বাধীনতার মূলমন্ত্র–গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও স্বাধীন জাতীয় বিকাশের জাতীয়তাবাদ; এগুলোর কোনটার সাথেই সঙ্গতি রক্ষা করে কেউই দেশ শাসন করেনি। স্বাধীনতার পর প্রথম নির্বাচন হয়েছিল ১৯৭৩ সালে। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশভাবে জিততে পারত, তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। কোন দরকার ছিল না জবরদখল, জালিয়াতি করার। কুমিল্লার দাউদকান্দিতে প্রাথমিক ফলাফলে রশীদ ইঞ্জিনিয়ারের নাম ঘোষণা সত্ত্বেও ঢাকায় ভোটের বাক্স এনে খন্দকার মোশতাককে পাশ করানো হলো। কেন? বিরোধী সব দল মিলে সর্বোচ্চ ১৮ থেকে ২৮ জন পাশ করতে পারতো। জিততে দেওয়া হলো মাত্র সাত জনকে। গোপালগঞ্জের প্রার্থী কমলেশ বেদজ্ঞকে খুন করা হলো। তার কর্মী কমিউনিস্ট পার্টির কমরেড লেবুসহ ৪ জনকে হত্যা করা হলো। এর কি প্রয়োজন ছিল? ১৯৭৩ সালে ডাকসু নির্বাচনে ব্যালট বাক্স হাইজ্যাক করার কি দরকার ছিল?

স্বাধীনতার পরেই দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলে সাত খুন দিয়ে সন্ত্রাসের রাজত্বের সূচনা হলো। রক্ষীবাহিনী গঠন করে বিরোধী দলের শত শত নেতাকর্মীকে হত্যা ও কারাগারে পাঠানো হলো। সংবিধানে কালাকানুনের সিংহদ্বার খোলা হলো দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে। বহুবার সরকার পরিবর্তন হলেও নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়নের সিংহদ্বার দ্বিতীয় সংশোধনী আজও বাতিল হয়নি।

স্থানীয় সরকারের কথা এসেছে, স্থানীয় সরকার বলতে বাস্তবে কিছু নেই বাংলাদেশে। পাঁচটা স্তর যদি ধরি—কেন্দ্র, বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন। ৬টা স্তর যদি ধরি, গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগ এবং কেন্দ্র। সংবিধানে বলা আছে প্রশাসনের সকল পর্যায়ের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি দ্বারা শাসনের কথা। কেন্দ্রে পার্লামেন্ট নির্বাচন আছে কিন্তু বিভাগে কী আছে? বিভাগ চালায় তো কমিশনার। তিনি তো আমলা। এখানে জনগণের নির্বাচিত সংস্থা কোথায়? জেলা চালায় ডিসি। ডেপুটি কমিশনারের বাংলা করেছে জেলা প্রশাসক। এটা কিছু হলো? একজন ডিসি, হবেন সচিব। প্রধান থাকবেন নির্বাচিত চেয়ারম্যান সচিব থাকবে ডিসি। কিন্তু তিনি হয়ে আছেন জেলা প্রশাসক! এটা কী ধরণের স্থানীয় শাসন? উপজেলার প্রধান হওয়ার কথা নির্বাচিত চেয়ারম্যানের আর ইউএনও সচিব হিসাবে থ াকবেন। ইউএনও কীভাবে হয় নির্বাহী প্রধান? অনুরূপ ইউনিয়ন কাউন্সিলে। এখন ইউএনও-এর নিয়ন্ত্রণে ইউনিয়ন কাউন্সিলররা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছেন। তাহলে স্থানীয় সরকারের কথা সংবিধানে লিখা রয়েছে। সকল পর্যায়ের জনপ্রতিনিধির কথা রয়েছে, এটা তো আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি কেউ-ই করেননি। আওয়ামী লীগ তার শাসনের ১৫ বছর এর ধারেকাছেও যায় নাই। এটা কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছিল। ভোটের খেলায় নানা রঙতামাশা দেখানো হয়েছে।

মালিকানার নীতি। ১৩ নং অনুচ্ছেদের (ক) বলা আছে, 'রাষ্ট্রীয় মালিকানা অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

গণ অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশ : ছাত্রসমাজ কী পাবে কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা ব্যবস্থা?

ছাত্র ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার সেমিনার অনুষ্ঠিত

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে ২৮ অক্টোবর নারায়ণগঞ্জ শহরের আলী আহাম্মদ চুনকা নগর পাঠাগারে গণ অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশ : ছাত্র সমাজ কী পাবে কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা ব্যবস্থা? শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

ছাত্র ফ্রন্ট নারায়নগঞ্জ জেলার আহ্বায়ক সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে সেমিনারে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, নারায়ণগঞ্জ সাংস্কৃতিক জোটের উপদেষ্টা রফিউর রাব্বী, সরকারি তোলারাম কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর বিমল চন্দ্র দাস, সাংবাদিক ও কলামিস্ট '৯০-এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা মাকসুদ ইবনে রহমান, বাসদ নারায়ণগঞ্জ জেলার সদস্যসচিব আবু নাঈম খান বিপ্লব, ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মুক্তা বাড়ৈ, নারায়ণগঞ্জ জেলার সাধারণ সম্পাদক নাসিমা আক্তার, সরকারি তোলারাম কলেজের শিক্ষার্থী তামিম আহাম্মেদ, নারায়ণগঞ্জ কলেজের শিক্ষার্থী শিফা, কদম রসুল ডিগ্রি কলেজের শিক্ষার্থী আহাম্মেদ রবিন স্বপ্ন।

কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন বলেন, জুলাই-আগস্ট ছাত্র-শ্রমিক জনতার গণ অভ্যুত্থানে আবারও অপরিসীম আত্মত্যাগ আর সংগ্রামের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করল এদেশের ছাত্রসমাজ, যা ইতিহাসে বিরল। এই অভ্যুত্থান ছাত্রদের কোটা সংস্কারের দাবিতে শুরু হলেও আসলে বাংলাদেশের নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ বিশেষ করে শ্রমজীবী মানুষসহ সকল ধর্ম-বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল স্তরের লোকজন অংশ গ্রহণ করে। তৈরি হয়েছিল ছাত্র, শ্রমিক-জনতার এক অভূতপূর্ব মেলবন্ধন। কিন্তু মানুষ যে আকাঙ্ক্ষা থেকে জীবন দিলো, ছাত্র- শ্রমিকরা বুকের তাজা রক্ত দিলো সেই শ্রমিকদের সন্তানের জন্য কি রাষ্ট্র শিক্ষার পরিপূর্ণ আয়োজন রেখেছে? নগরে আগুন লাগলে দেবালয় যেমন রক্ষা পায় না, তেমনি রক্ষা পাচ্ছে না দেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। স্বাধীনতার ৫৩ বছর পর দেশের শিক্ষার হালচিত্রটি কেমন? বর্তমান শিক্ষার প্রধান ধারা বেসরকারি ও বাণিজ্যিক ধারা। এক কথায় বলা যায়—'টাকা যার শিক্ষা তার'—এই নীতিতেই চলছে শিক্ষা কার্যক্রম। সংবিধানের ১৭ (ক) নং অনুচ্ছেদে একই পদ্ধতির শিক্ষার কথা থাকলেও এখানে চলছে সাধারণ, ইংরেজি মাধ্যম, কারিগরি, ক্যাডেট ও মাদ্রাসা শিক্ষা নামক বিভিন্ন ধারা। ইউনেস্কোর সুপারিশ মতে শিক্ষাখাতে জিডিপির ৬ ভাগ বরাদ্দের কথা থাকলেও এবছর আমাদের বরাদ্দ মাত্র ১.৭৬ শতাংশ, যেটা গত বাজেটের চেয়ে .০৭ শতাংশ কম এবং দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বনিম্ন। ব্যানবেইজ ২০১৯-এর রিপোর্ট অনুযায়ী সম্পূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর পূর্বে ১৮ শতাংশ শিক্ষার্থী, দশম শ্রেণি সমাপ্তের আগে মাধ্যমিক শিক্ষার্থী প্রায় ৩৮ শতাংশ এবং দ্বাদশ শ্রেণি সম্পূর্ণ করার পূর্বেই ২০ শতাংশ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থী শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ঝরে পড়ে অর্থাৎ গড়ে প্রায় ৭০ শতাংশ শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক সম্পূর্ণ করার পূর্বে বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পড়ে। এই ঝরে পড়ার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় এর মূল কারণ হচ্ছে দারিদ্র্য, আর্থিক অস্বচ্ছলতা। তাহলে যুগে যুগে ছাত্র জনতা যে বৈষম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য লড়েছে অর্থাৎ একটা সর্বজনীন শিক্ষা নীতি যেন প্রণীত হয় যার মাধ্যমে দেশের সকল শিক্ষার্থীর শিক্ষা সুনিশ্চিত হয়। কিন্তু তা কি এই আর্থ-সামাজিক পুঁজিবাদী কাঠামোতে সম্ভব?

কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন আরও বলেন, ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন প্রতিস্থাপিত হয় পাকিস্তানি প্রায়-উপনিবেশিক শাসন দ্বারা। শুরু থেকেই ভাষা ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মধ্য দিয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অন্যায় শাসন-শোষণকে পাকাপোক্ত করার পায়তারাকে প্রশ্ন করে রখে দাঁড়িয়েছিল ছাত্ররা।

ভাষা আন্দোলন ছাত্র রাজনীতি অন্যন্য মাত্রা যুক্ত করে, বুনিয়াদ গড়ে দেয় ভবিষ্যৎ লড়াইয়ের। তার এক দশক পরেই স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকার শিক্ষানীতিতে ব্যপক রদবদলের সিদ্ধান্ত নেয়। গঠিত হয় শরীফ কমিশন। কমিশনের রিপোর্টে বলা হয় শিক্ষা সস্তায় ও সহজলভ্য বিষয় বলে বিবেচিত হবে না। অর্থাৎ শিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে মুষ্টিমেয় কিছু ধনীর সন্তানদের জন্য শিক্ষা পরিচালিত হবে। এই ঘৃণ্য শিক্ষা সংকোচন ও বাণিজ্যিকীকরণ-নীতির বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মোস্তফা, বাবুল, ওয়াজীউল্লাহসহ শহিদদের রক্তের বিনিময়ে

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ২

পুঁজিবাদী নিয়ম বহাল রেখে শোষণ-বৈষম্যের অবসান সম্ভব নয়

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারি খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা; (খ) সমবায়ী মালিকানা; (গ) ব্যক্তিগত মালিকানা।' এখন এক নম্বর মালিকানা ব্যক্তিগত। সংবিধানের এই ধারা কি পরিবর্তন করে এটা করেছেন? পরিবর্তন না করে এটা কীভাবে করলেন? সংবিধান অনুযায়ী তো করতে পারেন না।

১৫ নং অনুচ্ছেদে বলা আছে, *রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন।* তারমানে পরিকল্পিত অর্থনীতি করবেন। কিন্তু চালু করে রেখেছেন মুক্তবাজার অর্থনীতি? তাহলে এটা তো সংবিধান লঙ্ঘন করা হলো। এ যাবৎকাল যত শাসকগোষ্ঠী দেশ পরিচালনা করেছে তারা প্রত্যেকে সংবিধান লঙ্ঘন করেছে। এই সংবিধান লঙ্ঘনের অপরাধে এদের প্রত্যেকের বিচার হওয়া উচিত। এই কথাটা কিন্তু কেউ বলছে না।

১৭ নং অনুচ্ছেদের (ক) লেখা রয়েছে, *একই পদ্ধতির গণমুখী সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য।* একই পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থা কি দেশে আছে।

এবারের আন্দোলনে পুলিশের নির্বিচার গুলির পাশাপাশি সরকারি দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের দ্বারা গুলিবর্ষণ, বেপরোয়া হামলা, লাঠিপেটা, হত্যাকাণ্ড সবই চলেছে। অনেকেই চিহ্নিত ছিল। এদের কাউকে বিচারের আওতায় না এনে অন্তত কয়েক ডজনকে আইনের মুখোমুখি করে শাস্তি বিধান না করে সংগঠন হিসাবে ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করা সুবিবেচনাপ্রসূত হয়নি। সুর্নির্দিষ্ট বিচার কার্যক্রম চলতে থাকলে ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ছাত্রলীগের সাথে থাকা বিভিন্ন পর্যায়ের লোকদের সহানুভূতি পেত না সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ নামধারীরা। জনগণ যাকে বাতিল করে দেয় তার উপর আইনি প্রলেপ অতটা জরুরি নয়। ১৯৭১ সালে ধর্মবাদী স্বাধীনতা বিরোধীরা জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। স্বাধীনতার দাবিদাররা স্বাধীনতার মর্মবস্তুকে যত অসার করে তুলেছে ততটাই সে সব স্বাধীনতা বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে। আমাদের দেশের ধর্মবাদীদের ৩ ধারা।

সৌদি আরবের ওহাবি ধারা; ভারতের দেওবন্দি ধারা আর সুফিবাদী ধারা। আমাদের এখানে মূলত, ইসলামের প্রচার হয়েছে সুফিবাদী ধারায়। এর সাথে সাংঘর্ষিক হলো এই ওহাবি ধারা। কিছুদিন আগে সৌদি বাদশা সালমান একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন বলে শোনা যায় যে, আমেরিকা নাকি জোর করে তাদের উপর ওহাবিবাদ চাপিয়ে দিয়েছিল। ইসলামের মূল কথা বলা হয় দুইটা। একটা হলো দাসত্ববিরোধী আরেকটা হলো ব্যক্তি সম্পত্তিবিরোধী। কারণ, বলা আছে সমস্ত সম্পদের মালিক হলো আল্লাহ। কোন মানুষ যদি সম্পদের মালিকানা দাবি করে তাহলে সে আল্লাহর সাথে শিরক করে। আর দাস বেলালকে মুক্ত করে তাকে দিয়ে আজান দেওয়ানোর মধ্য দিয়ে দাসত্ববিরোধী অবস্থান তুলে ধরা হয়েছিল মনে করা হয়। সুফিবাদীরা উদার ইসলামী পন্থা প্রচার করে। আমেরিকা দেখল রুশ বিপ্লবের পরে মধ্যপ্রাচ্যে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে তখন তারা ওহাবি মতবাদ ছড়িয়ে দিল। ইসলামের মূল বাণী পরিবর্তন করে দিল বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীতে। অর্থাৎ তুমি আল্লাহ বিশ্বাস করো কি করো না? কিন্তু প্রকৃত ইসলামী চেতনা তো এটা ছিল না। প্রকৃত ইসলামী চেতনা হলো তুমি দাস ব্যবস্থার উচ্ছেদ চাও কি না? আর তুমি ব্যক্তিমালিকানার পরিবর্তে সম্পত্তির মালিকানা আল্লাহর এটা মানো কি না? সেখান থেকে নিয়ে গিয়েছে আল্লাহকে বিশ্বাস করো কি না। কারণ এর মধ্য দিয়ে কমিউনিস্টদের আক্রমণ করার একটা অস্ত্র তৈরি হলো। প্রচার করা সহজ হয়ে গেল যে কমিউনিস্টরা ধর্ম মানে না। এইভাবে বামপন্থার রাজনীতিকে আঘাত করে দুর্বল করার একটা হাতিয়ার তৈরি করল। এটা আমাদের দেশে জামায়াতে ইসলাম করেছে। এদেশে যে সুফিবাদীরা ইসলাম প্রচার করেছিল তাদের বক্তব্য ছিল এক মায়ের যদি পাঁচটা সন্তান থাকে, তাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন মত থাকতে পারে। যে যে ধর্মে বিশ্বাসী লোক হোক না কেন আমরা সবাই মিলে যার যার বিশ্বাস নিয়ে সহাবস্থান করতে পারি। যে কারণে আমাদের শাহজালাল মাজার বা ভারতের আজমীর শরীফ মাজারে হিন্দুরাও যায়। এটাই সুফীবাদী ধারার মূল সুর। আর আমাদের সমাজ মননের মাঝে এই জিনিসটা আছে। ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মুসলমান বাংলাদেশের সঙ্গে সৌদি আরবের মিলবে না। পাকিস্তানের সাথেও তো মিলে নাই। একটা সমাজের জনগোষ্ঠীর ভাবমানস গড়ে ওঠার পেছনে নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি এই সমস্ত কিছু থাকে। এগুলি বাদ দিয়ে তাকে বিবেচনা করা যায় না। নতুন প্রজন্ম এই ইতিহাসগুলি এত ভালোভাবে জানে না।

প্রায় দুইশত বছরের ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে আমরা স্বাধীন হলাম। বাস্তবে স্বাধীনতা পেলাম না। ব্রিটিশ উপনিবেশের গোলামির হাত থেকে পাকিস্তানি উপনিবেশিক শেকলে বাঁধা পড়লাম। সামরিক আইনের শাসন, ২২ পরিবারের শোষণ, ধর্মীয় প্রতারণার সাংস্কৃতিক ও নৈতিক বাঁধন, মুখের ভাষা কেড়ে নেয়ার ঘোষণা, তৎকালীন (পূর্ব বাংলা) পূর্ব পাকিস্তান আজকের বাংলাদেশের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার ১০০ টাকার মধ্যে কেন্দ্রীয় শাসনের নামে ৯০ টাকা আত্মসাৎ, দ্রব্যমূল্য, শিক্ষা-স্বাস্থ্য সেবা, অপমান-অপদস্ততা সবকিছু মিলে ভাষা আন্দোলনের পথ বেয়ে ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে আমরা মুক্তির নিশানা উড়ালাম। কিন্তু জনগণের মুক্তি এলো না।

গত ৫৩ বছরের শাসন ক্ষমতার অনেক পরিবর্তন হয়েছে, রক্তাক্ত অভ্যুত্থান হয়েছে কিন্তু জনগণের ভাগ্যের মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। একই শোষক শ্রেণির মধ্যে শুধু ক্ষমতার হাত বদল হয়েছে। এবারও হাত বদলের অভিযোগ উঠছে। যদিও ১৯৭৫ সালের রক্তাক্ত সামরিক অভ্যুত্থান, ১৯৮২ সালের সামরিক অভ্যুত্থান, ১৯৯০ সালের গণ অভ্যুত্থান, ভোট চুরি ঠেকানোর পাহারাদার তদারকি চৌকিদার প্রবর্তন, ১/১১ পরোক্ষ সামরিক উত্থান, ভোট উধাও করে দেওয়ার ৩টি নির্বাচন (২০১৪, ২০১৮, ২০২৪) শেষে ৫ আগস্টের ছাত্র-শ্রমিক, জনতার গণ অভ্যুত্থান। এবারের গণ অভ্যুত্থানে বৈশিষ্ট্যগত অনেক উপাদান যুক্ত হয়েছে। পরিসরটাও অনেক ব্যাপক। শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রকে একশীলিভূত যন্ত্রে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের খণ্ডিত ইতিহাসকে নবপ্রজন্মের সামনে শেখ মুজিবের নেতৃত্বের সুবাদে মুজিবীয় আলোকে এতটাই উজ্জ্বল করে তোলা হয়েছিল যাতে পুরো ইতিহাসের অধ্যায়টিকেই অন্ধকারে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি এই মতান্ধতায় বিশ্বাসীদের নগদ নারায়ণ লাভের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো। খেতাব–উপঢৌকন, বাণিজ্য-মিডিয়া, পদ-পদবি, বিদেশ ভ্রমণ, ঋণখেলাপ, টাকা পাচার, গুম-খুন, কোন কিছুকেই আর লাগাম কিংবা জবাবদিহিতার মধ্যে রাখা হলো না। অনেক শিক্ষিত মানুষের বুদ্ধি বিভ্রাট হয়তো কাটতে পারতো, কিন্তু খ্যাতি ও নগদ প্রাপ্তি তাদের মগজে মন্দের ভালোর কুযুক্তি আর বিকল্পহীনতা ভাবার আত্মপ্রতারণা বিচার বিশ্লেষণের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল। আওয়ামী সরকারের পতন হতে পারে এমন কথায় অনেকেই তাচ্ছিল্যের হাসি হাসতেন। এখন তাদের দৌড় দেখে মানুষ হাসে। ৫৩ বছরের পুঞ্জিভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে ঘটেছে গণ অভ্যুত্থান। উপলক্ষ্য হিসাবে সামনে ছিল ছাত্রসমাজ, পশ্চাতে গোটা জাতি। সামনে হাল ধরতে এগিয়ে এসেছিলেন কুড়িয়ে আনা সুশীল এবং অনেক বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তিবর্গকে। এদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত অসততা কিংবা দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নাই, আবার রাষ্ট্র পরিচালনার মতো দায়িত্বশীল বিশেষ কর্মক্ষেত্রের দক্ষতাও নাই। নিয়মতান্ত্রিক ক্ষমতা বদল শাসকশ্রেণির পক্ষের প্রতারণা-লুটতরাজ, নিপীড়ন যত সহজ করে, গণ অভ্যুত্থানে গদিতে বসা শাসকদের পক্ষে শুরুতে কাজটা তত সহজ থাকে না। কারণ বড় ঝড় যেমন বড় তাণ্ডব সৃষ্টি করে তেমনি বড় ধরনের গণ-আন্দোলন, গণ অভ্যুত্থান, গণবিপ্লবও তেমনি আকাশচুম্বি প্রত্যাশা হাজির করে। আজকের দিনের বুর্জোয়া শ্রেণি সে আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয়। এটা তাদের শ্রেণিগত সীমাবদ্ধতা। সে কারণে মানুষ বারবার ফুঁসে উঠছে। সঠিক নেতৃত্বের অভাবে বারে বারে মার খাচ্ছে। আবারও দাঁড়াবার অবিরাম চেষ্টায় থাকছে। ৫৩ বছরের ইতিহাস সে সাক্ষ্য দেয়। এবারের অভ্যুত্থানকে অনেকে বিপ্লব বলতে চান। আসলে একদিন বুর্জোয়া শ্রেণির নেতৃত্বে ইংল্যান্ডে-ফ্রান্সে, আমেরিকায় বিপ্লব হয়েছিল। অর্থাৎ সেটা সামন্ত শ্রেণির বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণির ক্ষমতা দখরের বিপ্লব সেদিন গত হয়েছে। এখনকার দিনে সর্বহারা শ্রেণির দলের নেতৃত্বে এবং শ্রমিক-কৃষক মেহনতি মানুষের নিজস্ব শক্তি বলে শুধু ক্ষমতা বদল নয়, ব্যবস্থা বদলের গণ অভ্যুত্থানকে গণবিপ্লব বলা চলে। অন্য যেকোন গণ অভ্যুত্থানেও বিপ্লবের পরিপূরক অনেক উপাদান থাকলেও সেগুলি সর্বহারা গণবিপ্লবে উত্তরণ ঘটে না। তবে একটা গণ আন্দোলন যত ব্যাপকতা নিয়ে অগ্রসর হয় ততই তা নতুন নতুন গণপ্রত্যাশা জাগ্রত করতে থাকে। মানুষের মুখে নতুন ভাষার জোগান দেয়, মৃত্যুঞ্জয়ী মনোভাবকে অদম্য স্পৃহায় জাগাতে থাকে। যেমন চাকরির কোটা বিরোধী আন্দোলন রূপ নিল বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে। আবু সাঈদ নিঃশঙ্ক চিত্তে দাঁড়িয়ে গেল গুলির সামনে। অগণিত আন্দোলনকারীর মুখে উচ্চারিত বুকের ভিতর দারুণ ঝড়, বুক পেতেছি গুলি কর, গাইতে গাইতে এগিয়ে গেল মৃত্যুকে পরাস্ত করতে। তারপরও বৈষম্য অবসানের বিপ্লব হলো না। আবারও রক্তের অক্ষরে ইতিহাস এই শিক্ষা রেখে গেল বাম বিপ্লবীদের হুঁশে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ২৪ জন মিলে সংস্কারের কথা বলে চলেছেন। সংস্কারের কথা নতুন নয়। স্বাধীনতার পরপর '৭৩ সালে সংস্কার, '৭৫ পরবর্তী সংস্কার, '৮২ সালের সংস্কার, '৯০-৯১ সালের সংস্কার, ২০০৭-৮ সালের সংস্কার, ২০১০ পরবর্তী সংস্কার ইত্যাদি ছোটখাট নানা ধরনের সংস্কারের কথা মানুষ শুনেছে কিন্তু কার্যকর কোন ফলাফল দেখেনি। সেগুলোর কথা মনেও রাখেনি। পুঁজিবাদী লুটেরা শাসনব্যবস্থা চালাতে গিয়ে যেমন ময়লা-আবর্জনার স্তূপ জমে উঠে, সেগুলি সাফছুতরো করার জন্য একদল নতুন মুখ আবির্ভূত হয়। নতুন বোতলে পুরনো মদ ঢালা হয়। কিন্তু শোষণের যন্ত্র পুঁজিবাদ এর আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে আশু, মধ্যমেয়াদি ও সুদূর প্রসারী বিপ্লবী সংস্কার প্রক্রিয়া কখনও আসেনি। আসার কথাও নয়, কারণ শাসকশ্রেণি তো একই থাকছে। বোলচাল, পোশাক-পরিচ্ছেদ ইত্যাদি পালটাচ্ছে মাত্র। বর্তমান সংস্কারের বিষয়বস্তু সাধারণ মানুষ তো দূরে থাকুক, রাজনৈতিক দলগুলিই বিশদে ভালোভাবে জানে না। অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার কাজ মোটামুটি গুছিয়ে আনতে চার বছর সময়ের একটা হিসাব একভাবে মুখ ফসকে বলে ফেলেছেন। এ সময়কালে আরও কিছু অঘোষিত কাজ তারা সেরে নেবেন, তা দল গোছানো হোক, জরুরি বিধানে রাস্তা পাড়ি দেওয়া হোক বা অবস্থা সামাল দিতে না পারলে নতুন সমীকরণে নিষ্পত্তিতে যেতে পারে। ভারত এবং মার্কিনের দড়ি টানাটানিও কিছুটা অস্বস্তি তৈরি করছে। বিএনপি প্রমাদ গুনছে। আভ্যন্তরীণ সংহতি নড়বড়ে হওয়ার পথে। জাতীয় পার্টি বাঁকা রাস্তা খুঁজছে। জামায়াতে ইসলামীসহ ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তি তাদের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে সরকারের কাঁধে চাপতে চাইছে নানা আকারে প্রকারে। আন্দোলনের সামনে থাকা সমন্বয়কারীরা মূল হারিয়ে শাসন ক্ষমতার শাখা প্রশাখায় আশ্রয় নিয়ে ভবিষ্যত রাজনৈতিক নকশা বাস্তবায়নে মনোযোগী রয়েছে। যদিও দিনে দিনে সাড়া কমছে। কিছু প্রতিরোধও মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

বৈষম্যবিরোধী কথাটা তো আজকে আসে নাই। সেই ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু হয়েছে বিশেষ করে পাকিস্তানি প্রায় উপনিবেশিক আমলে ২২ পরিবারের শোষণ, এই বৈষম্য থেকে আমরা রেহাই চাই। সামরিক স্বৈরশাসন থেকে আমরা রেহাই চাই। একদিকে ধনী ২২ পরিবার অন্যদিকে অগণিত অসংখ্য নিরন্ন বিবস্ত্র মানুষ। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেই ১৯৭১ সাল হয়েছিল। এরপরেও বৈষম্যের কথা বারবার উঠেছে। মানুষ বারবার এর থেকে মুক্তি চেয়েছে কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বহাল থাকার কারণে সে আন্দোলনটা জনগণের হাতছাড়া হয়ে গেছে। এবারও তাই হবার শঙ্কা। প্রথমে তো বলল এটা বিপ্লব হয়ে গেছে। আসলে বিপ্লব হলো এক শ্রেণির হাত থেকে আরেক শ্রেণির হাতে ক্ষমতা নেয়া। এরা তো একই শ্রেণির মধ্যে আছে। চেহারা বদল হয়েছে শুধু। গণ অভ্যুত্থান হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নাই। বারবার এদেশের মানুষ দাঁড়িয়েছে আবারও দাঁড়াবে। মানুষের দাঁড়ানো বারবার ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে সামাজিক ব্যবস্থা বদলাচ্ছে না বলে। শুধু ক্ষমতার হাত বদল হচ্ছে। কিন্তু এই উপলব্ধিটা আমরা যদি নিয়ে যেতে পারি জনগণের কাছে, আমাদের কথাটা বলিষ্ঠভাবে হাজির করতে পারি, ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারি, ধারাবাহিক থাকতে পারি সেটাই হবে শিক্ষা ও ভবিষ্যতের সোপান।

সরকার কী বৈষম্য নিয়ন্ত্রণ করবেন নাকি, শোষণের নতুন চেহারা হাজির করবেন, নাকি বৈষম্য উচ্ছেদের রাস্তা নির্মাণ করবেন? এই বিষয়টার সুনির্দিষ্ট উত্তর তাদের কাছে নেই। আসলে উচ্ছেদের পথে তারা যাবেন না। তারা এটাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করবে। লাগাম টেনে ধরবে। অর্থাৎ হাসিনার আমলের লাগামহীন পুঁজিবাদের স্থলে এখন লাগামটানা পুঁজিবাদ চলবে। সামান্য কিছু অদল-বদলের পার্থক্য হবে। তার বেশি কিছু হবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আমরা লাগামটানা পুঁজিবাদ চাই না। আমরা তার উচ্ছেদ চাই। বৈষম্যের উৎপত্তিস্থল উচ্ছেদ করতে হবে। সে কারণেই মানুষ বারবার জীবন দিচ্ছে, লড়াই করছে। আর এটাকে পুঁজি করে একটা ক্ষুদ্রগোষ্ঠী সফল হচ্ছেন এতে মানুষ হতাশ হয়। এই হতাশা বিচ্ছিন্নতা তৈরি করে। এই হতাশা, বিচ্ছিন্নতা দীর্ঘদিন কাজ করে। ইউরোপে এই সময় ১০০ বছরও পার করে। কিন্তু আমাদের দেশে এত সময় লাগে না। ১৫/২০ বছরের মধ্যে মানুষ আবার ঘুরে দাঁড়ায়। ফলে মানুষ আবার ঘুরে দাঁড়াবে। মানুষের সামনে এই বিষয়টাকে স্পষ্ট করতে হবে। আওয়ামী শাসন ফ্যাসিবাদী ছিল। ফ্যাসিবাদ কী? ফ্যাসিবাদের একটা ভিত্তি থাকে। আপনি দালান করবেন সেটা কি ফাউন্ডেশন ছাড়া হবে? ফ্যাসিবাদ হাসিনা কেন করতে পারল? আইনকানুন, বিধিবিধান, প্রথা-প্রাতিষ্ঠান, শিক্ষা, সংস্কৃতি এইগুলিতে একটা ফ্যাসিবাদী জমিন যদি আপনারাও টিকিয়ে রাখেন তাহলে ফ্যাসিবাদের ডাল-পালা চলে গেল ঠিকই কিন্তু শিকড় তো রয়ে গেল। তাহলে কি ফ্যাসিবাদ যাবে? সেই ক্ষেত্রে আপনাদের পরিকল্পনা কী? আগের পুলিশ বাদ দিয়ে নতুন পুলিশ নেবেন

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

নারায়ণগঞ্জে অসিত বরণের বাসায় হামলাকারী সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তি নিশ্চিত কর

বিক্ষুব্ধ নাগরিক সমাজ

হত্যার উদ্দেশ্যে সাবেক কাউন্সিলর অসিত বরণ বিশ্বাসের বাসায় হামলাকারী সন্ত্রাসী রিয়াদ হাসান ও শারমিন হাবিব বিন্নির গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবিতে ২ নভেম্বর নারায়ণগঞ্জে নাগরিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সাবেক ১৫ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও বাসদ নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখার সদস্য অসিত বরণ বিশ্বাসকে হত্যার উদ্দেশ্যে তার বাসায় ও সচিব আবুল কালামের উপর হামলাকারী সাবেক কাউন্সিলর সন্ত্রাসী রিয়াদ হাসান ও সংরক্ষিত আসনের সাবেক কাউন্সিলর সন্ত্রাসী শারমিন হাবিব বিন্নিসহ সকল সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে নারায়ণগঞ্জের বিক্ষুব্ধ নাগরিক সমাজের উদ্যোগে নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে সমাবেশ ও শহরে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সাংস্কৃতিক ব্যক্তি রফিউর রাব্বির সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন খবরের পাতার সম্পাদক অ্যাডভোকেট মাহবুবুর রহমান মাসুম, কমিউনিস্ট পার্টির জেলার সভাপতি হাফিজুল ইসলাম, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ নারায়ণগঞ্জ জেলার আহ্বায়ক নিখিল দাস, গণতান্ত্রিক আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আওলাদ

হোসেন, নিতাইগঞ্জ পাইকারী ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শংকর সাহা, নারায়ণগঞ্জ সাংস্কৃতিক জোটের উপদেষ্টা ভবানী শংকর রায়, সাধারণ সম্পাদক ধীমান সাহা জুয়েল, গণসংহতি আন্দোলন নারায়ণগঞ্জ মহানগর শাখার সমন্বয়ক নিয়ামুর রশীদ বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার সভাপতি সাইফুল ইসলাম, সনাতন ছাত্র সমাজের আহ্বায়ক অভিজিত সাহা, সনাতন পাল লেন পঞ্চায়েত কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাজিম আহমেদ। ঘটনার বিবরণ দেন নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ১৫ নং ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর অসিত বরণ বিশ্বাস।

সমাবেশে রফিউর রাব্বি বলেন, ২৭ অক্টোবর দিবাগত রাত ১ টায় সাবেক কাউন্সিলর অসিতের বাড়িতে তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে দুইটি দরজা ভেঙে রিয়াদ ও বিন্নির নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা প্রবেশ করে। তাকে ঘরে না পেয়ে ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়। সিসি টিভি ফুটেজে রিয়াদ ও বিন্নির উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া গেছে। ২৮ অক্টোবর অসিত বাদী হয়ে নারায়ণগঞ্জ সদর মডেল থানায় মামলা দেয় কিন্তু ওসি ৪ দিন ঘুরিয়ে ২ নভেম্বর মামলা গ্রহণ করে। এখনও রিয়াদ বা বিন্নিকে গ্রেপ্তার করেনি। বিগত স্বৈরাচারী আওয়ামী শাসনে আমরা আওয়ামী লীগ বশংবদ পুলিশ দেখেছি। ছাত্র শ্রমিক জনতার অভ্যুত্থানের পরে একটি অন্তবর্তী সরকারের সময়ে পুলিশ কার ইশারায় চলছে? আমরা অবিলম্বে সন্ত্রাসী রিয়াদ ও বিন্নিসহ হামলাকারী সকল সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার দেখতে চাই।

মাহবুবুর রহমান মাসুম বলেন, অসিত বরণ বিশ্বাস পর পর ৩ বার কাউন্সিলর নির্বাচিত। সারাদেশের মধ্যে একজন সৎ, আদর্শবান, নির্ভিক কাউন্সিলর হিসাবে অসিত পরিচিত। এরকম একজন কাউন্সিলরের বাসায় রাতের অন্ধকারে রিয়াদ ও বিন্নির নেতৃত্বে আক্রমণ হয়েছে। সর্বস্তরের নারায়ণগঞ্জবাসী ধিক্কার জানাচ্ছে। কাউন্সিলর অসিতের সচিব আবুল কালাম তাকে উদ্ধারের জন্য গেলে পথে ২ নং রেলগেইটে বিন্নিসহ ১০-১৫ জন কালামকে ব্যাপক মারধর করে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় কালাম চিকিৎসাধীন আছেন। তারপরও আসামি গ্রেপ্তারে পুলিশকে গড়িমসি করতে দেখছি। আগে ওসমান পরিবারের প্রভাবে পুলিশ পরিচালিত হতো। এখন কার প্রভাবে পুলিশ চলছে আমরা তা জানতে চাই। জনতা হাসিনাকে হটিয়েছে। প্রশাসন যদি দুর্বৃত্তদের পক্ষ নিয়ে তাদের গ্রেপ্তার না করে তাহলে নারায়ণগঞ্জবাসী পক্ষপাতদুষ্ট ডিসি, এসপি, ওসিকে জেলা থেকে বিদায় করে দিবে।

সমাবেশ শেষে শহরে একটি বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে ক্ষতিকর প্রকল্প বাতিল কর

জাতীয় সক্ষমতা বিকাশ, নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে প্রাধান্য দেওয়ার দাবি

তেল-গ্যাস-খনিজসম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি ঢাকা মহানগর শাখার উদ্যোগে ৬ নভেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, আওয়ামী লীগ ১৫ বছর জবরদস্তিমূলকভাবে একটানা ক্ষমতায় থেকে জ্বালানি খাতসহ বিভিন্ন খাতে ব্যাপক লুণ্ঠন চালিয়েছে। এ নিয়ে যাতে মানুষ কথা বলতে না পারে তার জন্য দায়মুক্তি আইন করেছে। মন্ত্রী-এমপি, জ্বালানি উপদেষ্টা, সচিবরা এর সাথে যুক্ত। তারা অবৈধভাবে জনগণের পকেট কাটার জন্য ব্যবসায়ীদের সুযোগ করে দিয়েছে। কুইক রেন্টালের নামে কুইক ডাকাতি হয়েছে।

আমাদের নিজেদের গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের জন্য মনোযোগ দেওয়া হয়নি। বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা আছে ২৫ হাজার মেগাওয়াট উৎপাদন হচ্ছে ১৩ হাজার মেগাওয়াট। বিগত সরকার বিভিন্ন ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর সাথে মুনাফার স্বার্থে বিদ্যুৎ উৎপাদনে চুক্তি করেছে। এর মধ্য দিয়ে তারা হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট করে নিয়ে গিয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ভারতকে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা দিয়ে গেছে। আমাদের গ্যাস অনুসন্ধান করতে যে টাকা লাগতো তার চেয়ে ৫০ গুণ বেশি খরচ করে এলএনজি আমদানি করেছে।

তিনি আরও বলেন, গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের জন্য জাতীয় সক্ষমতা বাড়াতে হবে। বিদেশি কোম্পানির সাথে কোন চুক্তি অন্তবর্তীকালীন সরকার করতে পারবে না। রামপাল-রূপপুর প্রকল্পের মতো ভয়াবহ সকল প্রকল্প বাতিলের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। প্রয়োজনে এর জন্য আমরা কাগজপত্র দিব। ফুলবাড়ী চুক্তি বাস্তবায়ন করতে হবে, আন্দোলনকারীদের নামে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। সৌর বিদ্যুৎ-বায়ুবিদ্যুৎ, প্রাকৃতিক গ্যাস ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিদ্যুৎ উৎপাদান নিশ্চিত করতে হবে। জ্বালানি অপরাধী মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সচিব ও উপদেষ্টাদের বিচার করতে হবে।

নগর কমিটির অন্যতম সমন্বয়ক খান আসাদুজ্জমান মাসুমের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন নগর কমিটির নেতা খালেকুজ্জামান লিপন, ডা, সাজেদুল হক রুবেল, মীর মোস্তাক হোসেন । সমাবেশে শেষে মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

গাজীপুরে বাসদের সমাবেশে বিএনপির হামলা ও ভাঙচুরের প্রতিবাদ

বাম গণতান্ত্রিক জোট

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গাজীপুর জেলা শাখা আয়োজিত সমাবেশে ২২ নভেম্বর বিএনপির সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে সভার মঞ্চ, চেয়ার-টেবিল ভাঙচুর এবং ব্যানার কেড়ে নেয়ার প্রতিবাদে ও সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার-বিচারের দাবিতে বাম গণতান্ত্রিক জোট গাজীপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ২৩ নভেম্বর প্রতিবাদ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত।

জেলা বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক ও সিপিবি সাধারণ সম্পাদক কমরেড রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সিপিবি গাজীপুর জেলার সভাপতি কমরেড জয়নাল আবেদীন খান, বাসদ গাজীপুর জেলার সদস্যসচিব রাহাত আহমেদ, বাসদ (মার্কসবাদী) গাজীপুর জেলার সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রেজা। সমাবেশ পরিচালনা করেন বাসদ গাজীপুর জেলার সদস্য হারুন অর রশিদ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বাসদের সমাবেশে হামলা ও ভাংচুরের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানান। নেতৃবৃন্দ বলেন, মাত্র তিন মাস আগে ছাত্র-জনতার গণ অভ্যুত্থানের মূল স্লোগান ছিল বৈষম্যবিরোধী ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ। যেখানে মানুষ মত প্রকাশের স্বাধীনতা পাবে। অথচ আমরা দেখলাম বিএনপি ইতিমধ্যে ফ্যাসিবাদী কায়দায় অভ্যুত্থানের চেতনা বিরোধী অবস্থান নিয়ে বাসদের সমাবেশে হামলা করেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে দখল, পাল্টা দখল, আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে চলছে। গ্রেপ্তার বাণিজ্য, চাঁদাবাজী এবং বড় বড় পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সুপারিশ করে ক্ষমতার চর্চা শুরু করেছে। যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এর মধ্যদিয়ে পতিত আওয়ামী স্বৈরাচারের চেহারারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। কেউ কোথাও প্রতিবাদ করলে কিংবা দাবিদাওয়া উত্থাপন করলে যাকে তাকে আওয়ামী লীগের দোসর হিসেবে টেগ করে দিচ্ছে। এটা দেশের মানুষ মেনে নিবে না। জুলাই গণ অভ্যুত্থান এই শিক্ষাই দিয়েছে যে, মানুষ কোনো স্বৈরশাসককে মেনে নেয় না এবং প্রতিরোধ করে। বিএনপি এখন অতীতের স্বৈরাচারের পথে হাঁটতে শুরু করেছে যার ফল শুভ হবে না।

নেতৃবৃন্দ বলেন বামপন্থিরা শ্রমজীবী মানুষকে সাথে নিয়ে ফ্যাসিবাদ এবং স্বৈরাচারের ভিত্তিমূল উৎপাটনে বদ্ধ পরিকর।

উগ্র জাতীয়তাবাদী-সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার বিরুদ্ধে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চেতনায় গণঐক্য গড়ে তুলুন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংসদীয় রাজনীতিতে পাল্লা দিতে বিজেপির ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও উগ্র জাতীয়তাবাদী অপপ্রচারের সাথে নিজেদের যুক্ত করেছে। যদিও আমরা মনে করি না যে, উগ্র জাতীয়তাবাদী ও সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা সৃষ্টি করার পেছনে এটাই বিজেপির একমাত্র উদ্দেশ্য।

আমরা সাধারণ মানুষের কাছে এই মুহূর্তে যে গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা তুলে ধরতে চাই তা হলো এই যে, অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের এই রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ভারতের শাসকশ্রেণির মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। গত ১৫ বছরে বাংলাদেশের স্বৈরতান্ত্রিক সরকারকে ক্ষমতায় টিকে থাকতে ভারতের শাসকশ্রেণি সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করেছে এবং তার বিনিময়ে হাসিনা সরকার আমাদের দেশের জনগণের স্বার্থকে উপেক্ষা করে ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণি বা বিশেষভাবে করপোরেট জায়ান্ট আদানি-আম্বানিকে ব্যবসা-বাণিজ্য করার অন্যায্য সুবিধা করে দিয়েছে। আমাদের দেশের সম্পদ ব্যবহার করে উচ্চহারে মুনাফা করার জন্য অন্যায্য চুক্তির মাধ্যমে আদানি-আম্বানি বিভিন্ন খাতে বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে। গণ অভ্যুত্থানের পর নতুন সরকার জনগণের দাবির প্রেক্ষিতে সেইসব বৈষম্যপূর্ণ ও অন্যায্য চুক্তি পুনর্বিবেচনার ঘোষণা দিয়েছে এবং সেই কারণে আদানি-আম্বানির পুঁজির মুনাফা ঝুঁকির মুখে পড়েছে। এই আদানি-আম্বানির মতো ক্রনিক ক্যাপিটালের তল্পিবাহক এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সেই পুঁজির ফেরিওয়ালা ভারতের মোদি সরকার। আদানি-আম্বানির পুঁজির স্বার্থ যাতে অভ্যুত্থান-উত্তর বাংলাদেশে অক্ষুণ্ন থাকে তা নিশ্চিত করতেই মোদি সরকার বাংলাদেশের উপর চাপ সৃষ্টি করতে নানা পন্থা অবলম্বন করেছে এবং গদি- মিডিয়াকে দিয়ে বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে উসকানিমূলক অতিরঞ্জিত খবর ভারতে প্রচার করছে। আমাদের দেশে আদানি-আম্বানির বিরুদ্ধে নেওয়া সিদ্ধান্ত যে, মোদি-আদানির যৌথ অপকর্মের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ এবং বাংলাদেশের জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন—সেই সত্যকে ভারতের শ্রমজীবী সাধারণ মেহনতি মানুষের কাছ থেকে আড়াল করতে উগ্র জাতীয়তাবাদী উন্মাদনা সৃষ্টি করা হচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা বাসদের পক্ষ থেকে মনে করি যে, এই প্রবণতার বিপরীতে বাংলাদেশে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চেতনায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং তার মাধ্যমেই উগ্র জাতীয়তাবাদ ও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে মোকাবিলা করতে হবে এবং একমাত্র সেই পথেই তা করা সম্ভব।

ভারতের শাসকশ্রেণি উগ্র জাতীয়তাবাদী হুংকারের পাশাপাশি ভারতের জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা ছড়িয়ে দিতে চায়। গণ অভ্যুত্থানের পরে বাংলাদেশে তিনদিন কোন সরকার ছিল না, আভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী পুলিশ বাহিনী ছিল ছন্নছাড়া ও উদ্যোগহীন। এই সুযোগে দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে আওয়ামী লীগের অপশাসন, গণতন্ত্রহীনতা, দুর্নীতি, ছাত্রলীগের অপকর্মের বিরুদ্ধে জনমনে যে ক্ষোভ ছিল তার নিয়ন্ত্রণহীন বর্হিপ্রকাশ ঘটে। এই ক্ষোভের প্রকাশ অনেক জায়গাতেই সহিংস হয়ে ওঠে। এই সময়েই আওয়ামী লীগের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেকের উপর অনভিপ্রেত রাজনৈতিক হামলা হয় এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন হিন্দু জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত। তবে এই কথা সত্য যে, এই সুযোগে কোন কোন ক্ষেত্রে স্বার্থান্বেষী সুযোগসন্ধানীরা সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ করেছে। তবে তার সাথে এটাও সত্য যে, বিভিন্ন জায়গায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মানুষ এই সব আক্রমণকে প্রতিহত করেছেন এবং সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে মাঠে নেমেছেন। আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি একটিমাত্র ঘটনা ঘটে থাকলে তাও অত্যন্ত নিন্দনীয়। কিন্তু, ভারতের গদি-মিডিয়া এইসব অনভিপ্রেত ঘটনাকে আংশিকভাবে তুলে ধরে, সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে, অতিরঞ্জিত করে ঢালাওভাবে প্রচার করে চলেছে দুই দেশের মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টি করার জন্য। এই চক্রান্তকে আমাদের সকল অর্থে ব্যর্থ করে দিতে হবে।

সাম্প্রদায়িকতা এবং উগ্র জাতীয়তাবাদ–দুটোই শ্রমজীবী, মেহনতি মানুষের শত্রু, কারণ তা মেহনতি মানুষের ঐক্যে বিভাজন ঘটায়। শুধু তাই নয়, আমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে, উগ্র জাতীয়তাবাদ এমনই ভয়ঙ্কর যে তা মানুষের স্বাভাবিক বোধবুদ্ধি, হিতাহিত জ্ঞান লোপ করে দেয়, একদেশের মেহনতি মানুষকে অন্যদেশের মেহনতি মানুষের বিরুদ্ধে লড়াইতে নামিয়ে দেয়। ভুলিয়ে দেয় যে, দুই দেশের সাধারণ শোষিত মেহনতি, শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ এক এবং তাদের পারস্পরিক ঐক্যই আজকের দিনে প্রগতির পথ। এই উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রকোপ এমনই যে, তার বিষময় ফল থেকে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অনেক নেতাও নিজেদের রক্ষা করতে পারেননি এবং কমরেড লেনিনকে তাই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ভেঙে দিতে হয়েছিল। তার থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যে, আমরা যেন ভারতের শাসক বুর্জোয়াশ্রেণি ও মোদির এই উগ্র জাতীয়তাবাদী উন্মাদনা সৃষ্টির চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিতে পারি।

সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চেতনায় গণ-ঐক্য সৃষ্টির মাধ্যমে উগ্র জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি যে আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পরিপন্থি, তা ভারতসহ উপমহাদেশের অন্যান্য দেশ এবং বিশ্বের জনগণ তথা প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক সকল শক্তির কাছে তুলে ধরতে হবে। ভারতের শাসকগোষ্ঠী এবং ভারতের জনগণকে আমরা এক কাতারে বিচার করি না। সেই কারণে গদি- মিডিয়ার প্রচারে ভারতের জনগণের এক অংশ বিভ্রান্ত হলেও আমাদের উচিত হবে না পালটাপালটি বক্তব্য দিয়ে জাতীয়তাবাদের উগ্র উন্মাদনাকে বাড়িয়ে তোলা। বরং এই মুহূর্তে আমাদের উচিত হবে তাদের সামনে মোদি সরকার ও ভারতের শাসক বুর্জোয়া শ্রেণির অভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্রের চিত্রটি তুলে ধরা। আমরা দুই দেশের মেহনতি মানুষের ঐক্য চাই এবং দৃঢ় কণ্ঠে বলতে চাই–দুইদেশের মেহনতি মানুষের স্বার্থ এক, লড়াই এক এবং ভবিষ্যতের লক্ষ্যও এক।

আমরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের সময় শোষণমুক্ত অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চেতনার বাংলাদেশের আশা ব্যক্ত করেছিলাম। গত ৫৩ বছরে শাসকশ্রেণি বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক সুবিধাবাদীতার জন্য নানা অপশক্তির সাথে যুক্ত হওয়ার তাগিদে সেই চেতনার বিপরীতে দেশ পরিচালনা করায় তা অপূরিতই থেকে যায়। আমরা মনে করি এবারও অনুরূপ অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চেতনাকে ধারণ করেই জুলাই-আগস্টের ছাত্র-শ্রমিক, জনতার বৈষম্যবিরোধী গণ অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়েছে। আমরা লক্ষ্য না করে পারি না যে, কোন কোন মহল স্বৈরাচারবিরোধী স্লোগানকে হাতিয়ার করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার অর্জন ও ইতিহাসকেই মুছে ফেলতে তৎপর হয়ে উঠেছে।

আমরা মনে করি সেই প্রচেষ্টা অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চেতনার অস্তিত্বের পক্ষে এক অশনিসংকেত এবং একাত্তরের পরাজিত শক্তিকে পুনর্বাসনের সুপ্ত বাসনার প্রকাশ। বাম গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তিকে এই প্রবণতার বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে অবস্থান নিতে হবে এবং ২০২৪ সালের অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হওয়া জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষা যাতে পূর্ণতা পায় তার জন্য জোটবদ্ধ লড়াই অব্যাহত রাখতে হবে। জাতীয় পরিসরে গণ-ঐক্যের ধারাকে আরও শক্তিশালী ও মজবুত করার জন্য সকল বাম প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতিও আমরা আহ্বান জানাই। নতুন সরকার যাতে এই লক্ষ্যে সংস্কারকে ত্বরান্বিত করে দ্রুত একটি সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে; তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

আমরা অন্তর্বর্তী সরকারকে দেশের আর্থিক সংকট নিরসন, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি রোধ করে জনজীবনে স্বস্তি ফিরিয়ে আনা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা, শ্রমজীবী মানুষের মুখে ভাত তুলে দেওয়া, হাতে কাজের সুযোগ তৈরি করাসহ বিদ্যমান সংকট মোকাবিলায় আরও উদ্যোগী ও মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানাই। কারণ দেশের আভ্যন্তরীণ সমৃদ্ধি ও সংহতি বাইরের যে কোন বৈরী পরিস্থিতি মোকাবিলায় কার্যকর শক্তি জোগায়।

পুঁজিবাদী নিয়ম বহাল রেখে শোষণ-বৈষম্যের অবসান সম্ভব নয়

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

কী না, যারা গুলি করেছে, হত্যা করেছে তাদের শাস্তি অবশ্যই হওয়া দরকার, সংস্কার দরকার। কিন্তু জনগণের জন্য শোষণমুক্ত সমাজ নির্মাণের সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করে এই সংস্কারগুলি হবে না কি জনগণের আন্দোলনকে দমন করার অংশ হিসেবে সংস্কার কার্যগুলি পরিচালিত হবে? এখনই তো চলছে একটা অরাজকতা ও উন্মাদনা। এখন ছাত্ররা বলছে এই শিক্ষক থাকতে পারবেন না, চলে যান। কাউকে সরানো প্রয়োজন হলে আইনানুগ পদ্ধতিতে সরাও। এখন আওয়ামী লীগের কর্তৃত্ববাদের পরিবর্তে অন্যদের কর্তৃত্ববাদ শুরু হয়েছে। রাষ্ট্রপতিকে সরানোর জন্য সবাই একজোট হলো কিন্তু এদের মাথায়ই নাই রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ করার কোনো পদ্ধতিই এখন নাই। রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করতে পারে স্পিকারের কাছে। কিন্তু স্পিকার তো এখন নাই। ডেপুটি স্পিকার নাই, সংসদ নাই। তাহলে অভিশংসন করতে হবে। কিন্তু কে করবে? প্রধান বিচারপতির মতামত নিতে পারত। কিন্তু ছাত্ররা যেভাবে চলে গেল খেয়ালই করল না আন্তর্জাতিক দুনিয়া কী দেখল। ইউনূস সাহেব জানে ভাবমূর্তি কীভাবে নষ্ট হচ্ছে, তাই তিনি বিএনপিসহ এটাকে ম্যানেজ করার চেষ্টা করলেন। ফ্যাসিবাদ যখন আসে তখন সে একটা জনপ্রিয়তা নিয়েই আসে। হিটলার অজনপ্রিয় হয়ে ফ্যাসিবাদ কায়েম করে নাই। যখন এসেছিল তখন উগ্র জাত্যাভিমান তৈরি করে এসেছিল। সবচেয়ে বেশি ভোটে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। মুসোলিনির ক্ষেত্রেও তাই। এরাও এখন যেটা করছে তা হলো এই উন্মাদনার কাছে নতি স্বীকার করছে। আর এর খেসারত গোটা জাতিকে দিতে হচ্ছে। আমরা আওয়ামী লীগের শাসনকে বৈধতা দেওয়ার কথা বলছি না। কিন্তু এর বিপরীতে এসে অনুরূপ জিনিস ভিন্ন কায়দায় করলে জনগন সেটা মেনে নিবে না।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, ঐতিহ্য নিয়ে নানান ধরনের ব্যাখ্যাকারী যাই থাক না কেন, তার বিপরীতে গোটা সমাজের মননকে ঘুরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় নাই, হবেও না। এটা নিশ্চিত। এদেশের আন্দোলনের ইতিহাস কী? আন্দোলন অভ্যুত্থান জনগণ সবই করেছে কিন্তু ফলাফল ঘরে তুলতে পারে নাই। লালনের একটা গান আছে, সময় গেলে সাধন হবে না। বীজের গুণে যদি গাছ হয়ও তাতে ফল ধরে না। জিন্নাহর সামনে না না বলেছিল কারা? বামপন্থিরা। ভাষা মতিনসহ যারা ছিল তারা বামপন্থিই ছিল। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার জন্য যে নারীরা বের হয়েছিল এরা কারা? এরা বামপন্থি। ভাষা আন্দোলন, '৬২ আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বামপন্থিদের বিশাল ভূমিকা ছিল। পাকিস্তান হওয়ার পরে এদেশের শ্রমজীবী কৃষক, মেহনতী মানুষের মাঝে আন্দোলনের শক্তি হিসেবে কারা ছিল? বামপন্থিরা। আওয়ামী লীগের শ্রমিক সংগঠন হয়েছে '৬৯ সালে কৃষক লীগ '৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময়ের কৃষক আন্দোলন কারা করেছে? বামপন্থিরা। ইলা মিত্র তো জীবন্ত ইতিহাস। কিন্তু বামপন্থিরা ফলটা নিতে পারল না। কারণ ষাটের দশকে তারা আন্তর্জাতিক বিতর্কে জড়িয়ে পড়ল। যদি সেই সময় বামপন্থিরা মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ থাকত তা হলে এখানে চীনের মতো পরিস্থিতি হতো। চিয়াং কাই শেক এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টি মিলে যৌথভাবে আন্দোলন করে স্বাধীনতার দিকে গিয়েছিল তেমনি বাংলাদেশেও বামপন্থিরা আর শেখ মুজিবের যৌথ নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ হতো। বামপন্থিদের এই সাংগঠনিক বিপর্যয় সেটা হতে দিল না বরং ইতিহাস থেকেই অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে। আমাদের অনেক ভুলভ্রান্তি আছে। ভুল থেকে মানুষ শিক্ষা নেয়।

এখন আরেকটা শব্দ পরিকল্পিতভাবে প্রচার করা হচ্ছে, মুজিববাদ। বলা হচ্ছে মুজিববাদী শাসন, মুজিববাদী সংবিধান। এক ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি মুজিববাদ কোথায় পেয়েছ দেখাও। দেখাতে পারলো না। খন্দকার ইলিয়াস নামে একজন মুজিববাদ নিয়ে একটা বই লিখেছিল। স্বাধীনতাত্তোর ছাত্রলীগের ভিতর থেকেও মুজিববাদ স্লোগান উচ্চারিত হয়েছিল। পরে তা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দিকে চলে গেছে। মুজিববাদ বলে বাস্তবে কিছু নাই। শেখ মুজিব কোন মতবাদ তৈরি করে বা লিখে যাননি। এখন মুজিববাদ বলে পরাস্ত আওয়ামী স্বৈরাচারের দিকে তীর ছোড়ার মানে হয় না। শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, এটা কেউ মুছবে কীভাবে? যদিও স্বাধীনতার পরে শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল স্বাধীনতার চেতনা বিরোধী শাসনকাল। তা হলেও স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বে উনি ছিলেন এটা অস্বীকার করবেন কীভাবে? আমি এবং আমার মতো অনেকেই আওয়ামী লীগ করতেন না কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছি। শেখ মুজিবরের নেতৃত্বে। যেটা করা হচ্ছে তা একটা ঘৃণার জিনিস থেকে আরেকটা গ্রহণযোগ্য জিনিসকেও ঘৃণিত করে ফেলা হচ্ছে।

সরকারের মনোযোগ সব বিষয়ের দিকে যাওয়া সঠিক হবে না। বাজারের দিকে তাকাতে হবে। মানুষ দুর্ভোগে আছে। শ্রীলঙ্কায় একটা অভ্যুত্থান হয়েছিল আপনারা জানেন। তখন সেখানে মূল্যস্ফীতি ছিল ৬৭ শতাংশ। আর এখন সেটা -০.৫০ শতাংশ। এর কারণ হলো ওখানে বামপন্থি কমিউনিস্টরা রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসেছে। এটা করলেন কীভাবে? উৎপাদন খরচ কত এবং তার বাজারদর কীভাবে নির্ধারিত হচ্ছে, এটা বিবেচনায় নিয়েছিল ওরা। আমাদের দেশে বাজার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সরকার পদক্ষেপ নিচ্ছে না? দায়িত্ব নেয়ার পর তাদের কাজের ফলাফল কি? ফলাফল হলো প্রায় পাঁচ হাজার লোকের কাছে কোটি টাকা জমা হয়েছে। মানুষ খাইতে পারে না, বহু জনের সংসার শেষ হয়ে যাচ্ছে আর একটা মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীর কাছে কোটি টাকা জমা হয় কীভাবে? ২১ জনের কাছে পাঁচ হাজার কোটি টাকার বেশি সম্পদ আছে দেশে। আর বাকি যদি ১০ কোটি মানুষ ধরি যাদের একজনের পক্ষেও দশ হাজার টাকা সঞ্চয় দেখানো সম্ভব নয়। তাহলে এই বৈষম্য দূর করার পথপন্থা কী? কর্মসংস্থানের উপায় কী? গণ-উন্মাদনায় সৃষ্ট আরাজকতা নিয়ন্ত্রণের উপায় কী? সেদিকে গুরুত্ব দিতে হবে।

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৩

গণ অভ্যুত্থান পরবর্তী অন্তর্বর্তী সরকারের শাসন বিপুল প্রত্যাশা আর অন্তহীন প্রতীক্ষা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যন্ত্রণার অবসান মনে হয় কখনো হবে না। কিন্তু হতাশ হলেও তো জীবন থেমে থাকে না, তাই সমস্যা সমাধানের আশায় আবার পথে নামে। কখনো ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে আবার কখনো সমষ্টিগত সমস্যা সমাধানের প্রত্যাশায় গণ আন্দোলনের পথে। সকল স্তরের মানুষের অংশগ্রহণে গণ আন্দোলনের তীব্রতা যে কী রূপ নিতে পারে তা দেখেছে দেশের জনগণ গত ৫ আগস্ট।

মানুষের আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা বুঝার মাপকাঠি কি আছে? স্লোগানে, দেয়াল লিখনে আর প্রতিবাদ মিছিলে মানুষের মনের আকুতির প্রকাশ ঘটে এটা ঠিক। কিন্তু তীব্রতা বুঝতে পারা যায় ঝুঁকি নেয়ার মানসিকতা থেকে আর ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ দেখে। সাঈদের মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার সাহস, মুগ্ধ'র আবেগময় সহযোগিতা ছাত্রদের বুকে শুধু মৃত্যুভয় উপেক্ষা করার সাহস জুগিয়েছে তাই নয়, স্পর্ধা তৈরি করেছে পুলিশ-বর্ডার গার্ড, আর্মিকে মোকাবিলা করার। এর সাথে যুক্ত হয়েছে শ্রমজীবীদের বিপুল অংশগ্রহণ, সন্তানের সাথে বাবা-মায়ের রাজপথে নেমে আসা। যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরকে মনে করা হতো সমাজ বিমুখ তারা সমাজের এই দুঃসময়ে দূরে সরে থাকেনি বরং নেমে এসেছে দলে দলে। রাস্তায় থাকে যে সমস্ত ছিন্নমূল মানুষেরা তারাও জীবন দিয়েছে। শতাধিক নিহত মানুষের খোঁজ নিতে কেউ আসেনি, অর্থাৎ তাদের কেউ নেই খোঁজ নেবার মতো। তারাও জীবন দিয়েছে এই আন্দোলনে। স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, গৃহী এবং গৃহহীন, বিত্তবান থেকে বিত্তহীন সকলকেই নাড়া দিয়েছে এই আন্দোলন আর সাধ্যমতো সাড়া দিয়েছেন সকলেই। পুলিশ বলেছে গুলি করে থামানো যাচ্ছে না এই মানব স্রোত, রাস্তা থেকে সরানো যাচ্ছে না ঘর ছেড়ে আসা মানুষকে। ফলে ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণআকাঙ্ক্ষার এক মহাসম্মিলন ঘটেছিল এই আন্দোলনে।

ক্ষোভের তীব্রতা যে কত ভয়ংকর হতে পারে সেটাও প্রত্যক্ষ করেছে দেশের মানুষ। স্থাপনা জ্বালিয়ে দেয়ার ঘটনা ঘটেছে অতীতে বহুবার কিন্তু এবার থানা জ্বালিয়ে দেয়ার ঘটনা ঘটেছে অনেক, পিটিয়ে হত্যা করেছে পুলিশকে, ক্ষমতাসীন দলের অনেক নেতার বাড়িঘর ভেঙেচুরে আগুন জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বের করে দিয়েছে ছাত্র লীগকে। গত ১৫ বছর যাদের কাছে মাথা নিচু করে ছিল সেই মাস্তানদের ঘাড় ধরে বের করে দিয়েছে। চারিদিকে এতো সাহসের ঘটনা ঘটছিল যে, মানুষ ভয় পেতে ভুলে গিয়েছিল। সবচেয়ে বড় ঘটনা, মানুষ ঘেরাও করতে গিয়েছিল গণভবন, প্রধানমন্ত্রী পালিয়ে যাওয়ার কথা শুনে মানুষ তা দখল করে নিয়েছিল। লুটপাট ন্যক্কারজনক ও অগ্রহণযোগ্য হলেও মানুষের ক্রোধের তীব্রতাটাও বিবেচনাযোগ্য। আগুনে পুড়েছে ৩২ নম্বর, ভস্মীভূত হয়েছে অনেক স্মৃতিবিজড়িত স্থান। মানুষ এসব বেদনার সাথে স্মরণ করবে তবে সাথে সাথে ভাববে, ক্রোধ কতটা তীব্র হলে মানুষ এসব জ্বালিয়ে দেয় আর এতো দোর্দণ্ড প্রতাপশালী যারা ভেবেছিল তাদেরকে কেউ সরাতে পারবে না তারা পালিয়ে যায়।

৫ আগস্ট স্বৈরশাসকের পদত্যাগ ও দেশত্যাগের পর ৮ আগস্ট বিপুল আশা আর উদ্দীপনায় শপথ নিলেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। চারমাস অতিক্রান্ত হলো। প্রায় ২ হাজার মানুষের মৃত্যু, প্রায় ৩০ হাজার আহত, ৫ শতাধিক অন্ধ হয়ে যাওয়া, শত শত মানুষের পঙ্গুত্ব বরণের মাধ্যমে যে অভ্যুত্থানের বিজয় তা নিয়ে আলোচনার সময় এখন এসেছে। সমাজের নানা অংশের মানুষের নানা চাওয়া থাকলেও মানুষ মোটাদাগে যা চেয়েছিল তা হলো–বিগত শাসনের মতো আর কোনো শাসন নয়, ফ্যাসিবাদের অবসান চাই, দুর্নীতি লুটপাট বন্ধ করা, মানুষের উপর নানা বাহিনীর নিপীড়ন বন্ধ কর, দ্রব্যমূল্য কমানো আর মানুষকে নিয়ে উপহাস এবং তামাশা বন্ধ কর। জনগণের ট্যাক্সের টাকায় চলা প্রতিটি প্রতিষ্ঠান আর ব্যক্তিকে জবাবদিহির আওতায় আসতে হবে। সব চাওয়া কেন্দ্রিভূত হয়েছিল সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন চাই।

স্বাধীনতার পর ৫২ বছর পার হয়ে গেলেও জনগণের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব নির্বাচন করা হয়ে উঠেনি। জনগণের কাছে জবাবদিহির দায় না থাকায় টাকা, পেশি শক্তি আর রাষ্ট্রযন্ত্রের শক্তি ব্যবহার করে সংসদে একদল 'মানি মেকার' এবং 'রুল ব্রেকার' তৈরি হয়েছে। নির্বাচিত বা অনির্বাচিত উভয়ক্ষেত্রেই ভিন্নমত দমন করে তৈরি হয়েছে একদলীয় নিপীড়নমূলক শাসন ব্যবস্থা।

সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত হলেও রাষ্ট্রের তিন বিভাগের (সংসদ, নির্বাহী ও বিচার) মধ্যে চেক অ্যান্ড ব্যালান্স না থাকায় ক্ষমতার পৃথকীকরণের অনুপস্থিতি ঘটেছে। সকল ক্ষমতা হয়ে গিয়েছিল এক ব্যক্তিতে কেন্দ্রীভূত। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীরা হয়ে গিয়েছিল দলীয় কর্মচারী বা সরকারি কর্মকর্তা। জনগণের সার্বভৌমত্ব লেখা ছিল সংবিধানের পাতায়, নাগরিক অধিকার ছিল দূরের ছায়ার মতো। মেগা প্রকল্পের মেগা দুর্নীতির দায় বহন করেছে মানুষ কিন্তু প্রশ্ন করার অধিকার ছিল না যে, কেন এই প্রকল্প, কার জন্যে প্রকল্প আর কত খরচের প্রকল্প। কেন ব্যয় ক্রমাগত বাড়ে আর কাজের মান দিন দিন খারাপ হয়? ক্ষুব্ধ জনগণ জানতে চেয়েছে তাদের ট্যাক্সের অর্থের হিসাব, নজরদারি ও জবাবদিহি কি থাকবে না?

সংবিধানে একের পর এক সংশোধনীর মাধ্যমে কাটাছেঁড়া করে রক্তাক্ত করা হয়েছে আর গণতান্ত্রিক অধিকারের পরিসর কমেছে। শাসকদের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে, কিন্তু 'জনগণের ইচ্ছা অথবা রাষ্ট্রের সঙ্গে জনগণের সামাজিক চুক্তি (সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট) দিন দিন দুর্বল হয়েছে। সংবিধানে যা লিখিত আছে তা না মানা আর যা লিখিত নেই সেই কাজ করা যেন ক্ষমতাসীনদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যা, আয়না ঘরে নির্যাতন, দুর্নীতির মাধ্যমে প্রভূত সম্পদ অর্জন, বিদেশে টাকা পাচার কোনটাই তো সংবিধানসম্মত ছিল না। কিন্তু সংবিধান এসব থেকে ক্ষমতাসীনদের নিবৃত রাখতে পারেনি।

গণতন্ত্রের কথা বহুল উচ্চারিত হলেও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল নির্বাচনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করার দৃষ্টান্ত দেখাতে পারেনি। আন্দোলন, সংসদ বর্জন ছাড়া নির্বাচন আদায় করার দৃষ্টান্তও কম। ক্ষমতা ছাড়তে না চাওয়া যেন ক্ষমতাসীন দলের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। গণতন্ত্রের ব্যাপারে মাথা না ঘামালেও পুঁজিপতিরা তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের স্বার্থে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা চায়। কিন্তু এক দলের শাসনের ধারাবাহিকতা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকেও বিনষ্ট করে ফেলেছে। সরকার ও রাষ্ট্র একাকার হয়ে সঙ্গে নাগরিকের সামাজিক চুক্তিকে উপহাসের বিষয়ে পরিণত করে ফেলেছে।

ফলে গণ আন্দোলন শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর মধ্যে থাকেনি; এই গণ অভ্যুত্থান ছিল ক্ষমতাসীনদের নিপীড়ন থেকে মুক্তির 'সামাজিক সম্মতি'। বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের আন্দোলনে তাই শ্রমিক-জনতা দলে দলে যুক্ত হয়েছে। বৈষম্য বিরোধী এই চাওয়া মুক্তিযুদ্ধের মৌল ভিত্তি তথা সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের ঘোষণার সাথে ছিল সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। জনগণ দেখেছে, ক্ষমতাসীনরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আর জনগণের সাথে করেছে প্রতারণা। ফলে মুক্তিযুদ্ধের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা ২০২৪ এর আন্দোলনে নতুন করে জেগে উঠেছে। যার প্রকাশ ঘটেছে গ্রাফিতিতে, দেয়ালে দেয়ালে আর মাথায় বাঁধা জাতীয় পতাকায়।

অর্থনীতিতে লুণ্ঠন দেশকে সর্বনাশের কিনারায় নিয়ে এসেছিল। অর্থনীতির সব সূচকের অবনতি ঘটছিল দ্রুতহারে। দীর্ঘস্থায়ী মূল্যস্ফীতির সঙ্গে শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরির ফারাক বেড়েই চলছে। মূল্যবৃদ্ধির কষাঘাতে দারিদ্র্যসীমার নিচের পরিবার শুধু নয়, নিম্ন ও নির্দিষ্ট আয়ের মানুষের জীবন ছিল পর্যুদস্ত।

অন্যদিকে বৈষম্যের জাঁতাকলে অধিকাংশ মানুষ জর্জরিত। নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্য-মধ্যবিত্ত জনতার কর্মসংস্থানে, আয় ও সঞ্চয়ে বড় ধরনের আঘাত পড়েছে। বেকারত্ব যুবকদের জীবনকে অনিশ্চিত ও বেপরোয়া করে তুলেছিল। সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে ভাঙন ধরে বিপুল সংখ্যক মধ্যবিত্ত দরিদ্রের কাতারে নামিয়ে এনেছিল। খাদ্যপণ্যের দাম বাড়লেও তার সুফল কৃষক পায় না, পায় মধ্যস্বত্বভোগীরা। কৃষক দিন এনে দিন খায় বা ঋণ করেই জীবনযাপন করতে হতো। মানুষের হাতে নগদ টাকায় টান পড়েছে। আর দেশি-বিদেশি ঋণে জর্জরিত সরকার তার দায় চাপিয়ে দিয়েছিল জনগণের কাঁধে। অসম শর্তে ঋণ আর তার শর্তের জালে বিদ্যুৎ-গ্যাস, পানির দাম বৃদ্ধি মানুষের জীবনে সংকটকে বাড়িয়ে তুলেছিল।

বৈদেশিক মুদ্রার মজুত ও সরবরাহে টান পড়েছিল, বাজারে দেখা দিয়েছিল তারল্য সংকট। বিলাসিতা আর বিপন্ন দশার এক অদ্ভুত সহাবস্থান তৈরি হয়েছিল। রাজনৈতিক দমন-পীড়নে অর্থনৈতিক সংকট কাটানো যে যায় না তা স্পষ্ট হয়েছিল দিনে দিনে। ফলে সব সমস্যার ফলে সৃষ্ট ক্ষোভ সরকারের বিরুদ্ধে এবং সরকারের পদত্যাগকে অনিবার্য করে তুলেছিল। কিন্তু এতো ক্ষমতা মদমত্ত সরকার তার সকল সাঙ্গপাঙ্গসহ দেশত্যাগ করবে এতটা ভাবা যায়নি।

কিন্তু সত্য কল্পনাকেও হার মানায়। শেখ হাসিনা পালিয়েছে। এখন প্রশ্ন, ব্যক্তি পালালেই কি ব্যবস্থা পালায়? এখন তো পলাতকের ছায়ার সঙ্গে লড়াই করে মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা যাবে না। প্রত্যাশা পুরনে তিন মাস যথেষ্ট সময় নয় কিন্তু শুরু করার জন্য একেবারে কম সময়ও নয়। মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তোলা দ্রব্যমুল্য নিয়ন্ত্রণ, আইন শৃঙ্খলাকে স্বস্তিদায়ক করা আর মানুষের মনে ভরসা দেয়া যে তাদের পাশে সরকার আছে, এটা এই মুহূর্তের কাজ। অভ্যুত্থানের সাংবিধানিক স্বীকৃতি পাওয়ার ব্যবস্থা তো করতে হবে তার জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।

অন্তর্বর্তী সরকারকে একটি কর্মপরিকল্পনা ও রোড ম্যাপ প্রণয়ন করে যত দ্রুত সম্ভব দেশে একটি সাধারণ নির্বাচন করার ব্যবস্থা করতে হবে। গত সরকারের আমলে যে অত্যাচার, অনাচার, দুর্নীতি হয়েছে তার বিচারের উদ্যোগ নিতে হবে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নেয়া, নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত হওয়ার পরে ও প্রয়োজনীয় আইন করে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের আয়োজন করতে হবে। এর মধ্য দিয়ে দেশ ফ্যাসিস্ট শাসন থেকে গণতান্ত্রিক সরকারের পথে একটি নতুন যাত্রা শুরু করবে।

এটা তো ঠিক রাষ্ট্রকাঠামোর পুঞ্জীভূত জঞ্জাল দ্রুত সরানো যাবে না। এই জঞ্জাল সরানোর জন্য এবং ভবিষ্যতে যাতে ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা না যায়, ক্ষমতা কাঠামোর সকল স্তরে জবাবদিহি নিশ্চিত থাকে, সে জন্য সংবিধানে কিছু সংশোধনী অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু বিশাল কাজের ফিরিস্তি তৈরি করে সময়ক্ষেপণ করা যেমন সন্দেহ তৈরি করবে তেমনি সমাজে অস্থিরতার জন্মও দেবে। পাশাপাশি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মধ্যেও দমনমূলক মানসিকতার জন্ম দিতে পারে। যা বিপজ্জনক হয়ে উঠার আশঙ্কা তৈরি করবে।

ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি তিন মাসেও। ফলে, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ হয়নি। বকেয়া মজুরি আদায়ের জন্য শ্রমিকদের বিক্ষোভ করতে হচ্ছে, দখলবাজীর হাত বদল হয়েছে, সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা সৃষ্টির ঘটনা ঘটছে, বিজয়ী হয়েছি এই মনোভাব থেকে নিয়ম বহির্ভূত কাজ করার প্রবণতা বেড়েছে এগুলো ভালো দৃষ্টান্ত নয়। কিন্তু মানুষ আশা করে, এই সরকার জনগণের পক্ষে থাকবে, শ্রমিকের উপর দমন-পীড়ন চালাবে না, কৃষকের পাশে থাকবে, সাধারণ মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্মান রক্ষা করবে। মানুষের প্রত্যাশা যেন মার না খায় এই দায়বোধ থেকে জনগণের ন্যূনতম চাওয়া পূরণে দেরি করা চলবে না।

সব সংস্কার শেষে নির্বাচন নাকি একটা সুষ্ঠু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়ার জন্য ন্যূনতম সংস্কার এই নিয়ে বিতর্ক চলছে। কিন্তু মানুষের কাছে প্রয়োজন তার জীবনটাকে সহজ করা। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির হিসাবে, আগস্টে ৩৮ শতাংশ নিম্ন আয়ের পরিবার খাদ্যনিরাপত্তাহীনতায় ভুগেছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৪৩ শতাংশ ধার করে খাবার কিনেছে। চাল, সবজিসহ অন্যান্য খাদ্যপণ্যের দাম অধিকাংশ মানুষের নাগালের বাইরে। বাজারে মোটা চালের কেজি ৫৫ টাকা, সরু চাল ৮০ টাকা। ডিমের দাম নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে ১৪৪ টাকা ডজন কিন্তু বিক্রি হচ্ছে ১৬০ টাকার বেশি দামে। ওষুধের দামে কোন লাগাম যেন নেই। মানুষের প্রশ্ন বাজার নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না কেন? অক্টোবর মাসে সরকারি হিসেবেই খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১২.৬৬ শতাংশ। মানুষ রাষ্ট্রের সংস্কার চায় কিন্তু তার সাথে সাথে সংসারটাও চালাতে চায়। দ্রব্যমূল্যের আঘাত আর বাজার সন্ত্রাস থেকে রেহাই চায়। মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে মুক্তভাবে লুটপাট চায় না। দ্রব্যমূল্য সহনীয় রাখা, সন্তানের শিক্ষা আর কাজ, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা আর সম্মানের সাথে বাঁচা সাধারণ মানুষের এই ন্যূনতম চাওয়াগুলো সংস্কারের বড় বড় কথা আর কথিত দ্বিতীয় স্বাধীনতা, বিপ্লব ইত্যাদি বুলির আড়ালে যেন হারিয়ে না যায়।

৪ মাস পার হলো। নানা অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক তুলে প্রয়োজনীয় কাজকে আড়াল করার চেষ্টা চলেছে। আওয়ামী লীগের শাসনামলে একটি কুযুক্তি ছিল, উন্নয়ন না গণতন্ত্র কোনটা চান? বেশি উন্নয়ন ভালো, এর জন্য প্রয়োজনে গণতন্ত্র একটু কম হোক অসুবিধা নেই। কিন্তু দিনের শেষে জনগণ দেখেছে উন্নয়নের নামে কী অপরিসীম লুটপাট হয়েছে। অর্থনীতির পঙ্গুত্ব আর অর্থ পাচার দুটোই বেড়েছে। গণতন্ত্রহীন মানুষ বোঝা বইছে লুটপাটের এবং দেশি-বিদেশি ঋণের। এখন তাই যদি বিতর্ক তোলা হয় সংস্কার না নির্বাচন তাহলে তা কিন্তু শেষে এক জটিল পরিস্থিতির মুখে ঠেলে দেবে দেশকে। সুষ্ঠু নির্বাচন এবং জবাবদিহিমূলক শাসন ব্যবস্থার জন্য যেটুকু সংস্কার দরকার সেটুকু করে নির্বাচন আয়োজন করাটাই জরুরি। কারণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বহাল রেখে আর সাম্রাজ্যবাদীদের পরামর্শ নিয়ে বৈষম্য দূর করা যাবে না। যদিও মানুষ সংগ্রাম করেছে, স্বৈরাচারী সরকারকে ক্ষমতা থেকে নামিয়ে দিয়েছে শোষণ-বৈষম্য দূর করার আশায়। কিন্তু এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তো তা পূরণ করতে পারবে না। তাই ন্যূনতম একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যেন প্রতিষ্ঠা হয় সেটাই এখন চাওয়া। মানুষের এই প্রত্যাশাটুকুও যেন অন্তহীন প্রতীক্ষার কানাগলিতে পথ না হারায়। তবে ৫৩ বছরের মুক্তিযুদ্ধের অপূরিত গণআকাঙ্ক্ষা সাম্যের বাংলাদেশ, সমাজতন্ত্রের অর্থনীতি, ধর্মনিরপেক্ষতার সমাজ ও স্বাধীন জাতীয় বিকাশের জাতীয়তাবাদের নিশানায় দেশবাসীর অগ্রসর হওয়া সময়ের দাবি ও সাম্প্রতিক গণ অভ্যুত্থানের বৈষম্যবিরোধী স্লোগানের মর্মকথা। সে পথেই এগুতে হবে।

গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্য-এর দ্রোহ-দাহ-স্বপ্নযাত্রা
বৈষম্যহীন বাংলাদেশ নির্মাণের প্রত্যয়

শোষণ-বৈষম্যহীন বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রত্যয় নিয়ে 'দ্রোহ-দাহ-স্বপ্নযাত্রা' শিরোনামে সাংস্কৃতিক সমাবেশ আয়োজন করেছে গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্য। ১৮ অক্টোবর কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে আয়োজিত হয় নবগঠিত সংগঠনটির প্রথম সাংস্কৃতিক সমাবেশ। সাংস্কৃতিক সমাবেশ উদ্বোধন করেন '২৪ গণ অভ্যুত্থানের শহিদ ফারহান ফাইয়াজের বাবা শহিদুল ইসলাম ভূঁইয়া এবং প্রবীণ কৃষকনেতা, যশোর ভবদহ পানি নিষ্কাশন সংগ্রাম কমিটির আহবায়ক, লোকসংগীত শিল্পী রণজিৎ বাওয়ালী।

শহিদ ফারহান ফাইয়াজের বাবা শহিদুল ইসলাম বলেন, ছাত্ররা বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছে। সেই সংগ্রাম করতে গিয়ে আমার একমাত্র সন্তান নিহত হয়েছে। তার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের দায়িত্ব আপনাদের। আপনারা তার স্বপ্নকে স্বার্থক করে তুলবেন সেটাই আমার প্রত্যাশা।

বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর সহসভাপতি জামসেদ আনোয়ার তপনের সভাপতিত্বে সমাবেশে ঘোষণাপত্র পাঠ করেন বিবর্তন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমান লাল্টু। এতে মব ভায়োলেন্সের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্থানে পিটিয়ে মানুষ হত্যা, পাহাড়ে অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে পাহাড়ি ও বাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত-সহিংসতা ও প্রাণহানির মতো মর্মান্তিক ঘটনার নিন্দা জানানো হয়। ঘোষণাপত্রে আরও বলা হয়, অন্তর্বর্তী সরকারের নতজানু নীতির কারণে দেশে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী অপশক্তির আস্ফালন জনমনে ভীতি ও আতঙ্কজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। দ্রুত শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবিও জানানো হয় সমাবেশের ঘোষণাপত্রে। আলোচনায় বক্তব্য

রাখেন শহিদ আসাদ পরিষদের শামসুজ্জামান মিলন, গণসংস্কৃতি কেন্দ্রের জাকির হোসেন, প্রগতি লেখক সংঘের কোষাধ্যক্ষ দীনবন্ধু দাশ এবং চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন খন্দকার শাহ্ আলম ও সুস্মিতা সুপ্তি।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, স্বৈরাচার শেখ হাসিনার সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার অভূতপূর্ব গণ অভ্যুত্থানের সময় জুলাই-আগস্টে নির্বিচার হত্যাকাণ্ড চালানো হয়। সেসব হত্যাকাণ্ডের বিচার কাজ শুরু হয়েছে, যা ইতিবাচক। তবে, বিচারকাজে যেন কোন অবহেলা না হয় এবং সত্যিকার অর্থে ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয় সে দাবি জানান বক্তারা। তারা বলেন, অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে অনেক কিছুই প্রায় স্বাভাবিক পর্যায়ে চলে এলেও এখন পর্যন্ত মুক্তভাবে সংস্কৃতি চর্চা করা যাচ্ছে না। রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমি সীমিত পরিসরে খুলে দেয়া হলেও জেলা-উপজেলা পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত অনেক সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্রই এখনও বন্ধ পড়ে আছে। সেগুলো অবিলম্বে মেরামত করে খুলে দেয়া এবং সংস্কৃতি চর্চার অবাধ ও মুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করার দাবি জানান সমাবেশের নেতৃবৃন্দ। আওয়ামী লীগ সরকারের সময় প্রণীত সব ধরনের নিপীড়নমূলক আইন বাতিল এবং এসব আইনে গ্রেপ্তার সবাইকে দ্রুত মুক্তি দেয়ার দাবি জানানো হয় সমাবেশে। এছাড়া, সব ধর্মীয় ও জাতিসত্ত্বার অধিকার নিশ্চিত করা এবং মাজার-মন্দির, আখড়া ও নারীর উপর আক্রমণ বন্ধ করার দাবিও জানান গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্য-এর দ্রোহ-দাহ স্বপ্নযাত্রা কর্মসূচির নেতৃবৃন্দ।

আলোচনাসভার পর শুরু হয় সাংস্কৃতিক পরিবেশনা পর্ব। এ পর্বে দেশবরেণ্য বেশ কয়েকটি সংগ্রামী সাংস্কৃতিক সংগঠন ও শিল্পীরা লাঠি খেলা, মূকাভিনয়, নৃত্য, আবৃত্তি, সংগীত ইত্যাদি পরিবেশন করে। এসব সংগঠন ও শিল্পীদের মধ্যে রয়েছে উদীচী, বিবর্তন, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, প্রগতি লেখক সংঘ, গণসংস্কৃতি কেন্দ্র, সংহতি সংস্কৃতি পরিষদ, সমাজ অনুশীলন কেন্দ্র, হাসান ফকরী, সমাজ চিন্তা ফোরাম, মাদল, সমগীত, গঞ্জে ফেরেশতা, ডিমোক্রেজি ক্লাউনস, সংজোয়ার, ঘওখ, টিম এজ অমিক্স, ভাটিয়াল শহুরে, দ্যা কমরেডস। নৃত্য পরিবেশন করে কথক নৃত্য সম্প্রদায়। মাইম শো করে ঢাকা ড্রামা এবং লাঠি খেলায় ছিল চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।

দীর্ঘ প্রায় দুই বছর ধরে প্রতিবাদী সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ নাম নিয়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন থেকে শুরু করে বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন বাতিল, ভোটাধিকার ও জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, দ্রব্যমূল্য ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসা, অর্থপাচার, ব্যাংক লুটসহ বিভিন্ন বিষয়ে ধারাবাহিক আন্দোলন-সংগ্রাম সংগঠিত করেছে গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্য। বিগত গণ অভ্যুত্থানে প্রথম কারফিউ ভঙ্গ, প্রতিবাদী গানের মিছিল ও দ্রোহযাত্রা আয়োজন ছিল ফ্যাসিবাদী সরকারের বিরুদ্ধে এই সংগঠনের অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও সাহসী কর্মসূচি। গণ অভ্যুত্থানের পর মোর্চাটি 'গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্য' নাম নিয়ে নব উদ্যমে কাজ শুরু করেছে।

বৈষম্যহীন সমাজ নির্মাণের লড়াই অব্যাহত রাখার আহ্বান

বাসদের মতবিনিময় সভা বরিশাল

জুলাই অভ্যুত্থানের প্রত্যাশায়

৭ নভেম্বর বাসদের ৪৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও রুশ বিপ্লবের ১০৭কম বার্ষিকী উপলক্ষে বরিশাল নগরীর কীর্তনখোলা মিলনায়তনে বিকেল ৪টায় জুলাই অভ্যুত্থানের প্রত্যাশায় বৈষম্যহীন সমাজ নির্মাণের লড়াই অব্যাহত রাখার আহবানে বাসদের মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাসদ বরিশাল জেলা শাখার সমন্বয়ক ডা. মনীষা চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময়সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) বরিশাল জেলা শাখার সভাপতি অধ্যক্ষ মিজানুর রহমান সেলিম, বাম গণতান্ত্রিক জোট বরিশাল জেলা শাখার সমন্বয়ক ও বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ বরিশাল মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক শাহ আজিজ খোকন, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি বরিশাল জেলা শাখার আহ্বায়ক শিকদার হারুনর রশীদ মাহমুদ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারি অধ্যাপক সঞ্জয় কুমার সরকার, বাংলাদেশ নৌ-যান শ্রমিক ফেডারেশন বরিশাল জেলা শাখার সভাপতি শেখ আবুল হাশেম, বাকবিশিস বরিশাল জেলা শাখার যুগ্ম সম্পাদক অধ্যাপক বীরেন্দ্রনাথ রায়, বিশিষ্ট আইনজীবী অ্যাডভোকেট আবু আল রায়হান, আইনজীবী অ্যাডভোকেট হাসিবুল ইসলাম, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ব্রজমোহন কলেজ শাখার অন্যতম সমন্বয়ক মো. সাব্বির হোসেন প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানে হাজারো ছাত্র-জনতা প্রাণ দিয়েছে, আবার এই অভ্যুত্থানকে কাজে লাগিয়ে এক ফ্যাসিবাদকে হটিয়ে আবারও শোষণমূলক স্বৈরাচারী ব্যবস্থা কায়েমের জন্য অনেকে সচেষ্ট হচ্ছেন। ২৬ সেপ্টেম্বরের এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, তিন মাসে তিন হাজার কোটিপতি বেড়েছে। বিভিন্ন পদে দলীয় সুপারিশে পদায়ন হচ্ছে, অথচ জুলাই অভ্যুত্থানে গণহত্যায় জড়িতদের বিচার হচ্ছে না। আহতদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নেয়া হচ্ছে না অথচ সারাদেশে টার্মিনালে-ঘাট, বাজারে-সর্বত্র দখলদারত্ব-লুটপাট চলছে। অভ্যুত্থানে নিহত ছাত্র-শ্রমিক লুটপাটের ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য জীবন দেয়নি।

কমরেড বজলুর রশিদ ফিরোজ বলেন, অন্তবর্তীকালীন সরকারের আশু কাজ জুলাই অভ্যুত্থানে হত্যাকাণ্ডের বিচার, আহতদের পুনর্বাসন, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনজীবনের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা। এপর্যন্ত মব কিলিংয়ে ঢাকায় ২৮ জনসহ সারাদেশে ১৫০ জন মানুষ গণপিটুনিতে নিহত হয়েছে। সিন্ডিকেট ভাঙার ব্যাপারে সরকারের এপর্যন্ত সাফল্য শূন্যের কাছাকাছি। সরকারের এসব আশু পদক্ষেপ নেয়ার ক্ষেত্রে উদ্যোগ পর্যাপ্ত না, কিন্তু সংবিধান বাতিল, রাষ্ট্রপতি অপসারণসহ সরকারের বিভিন্ন মহল থেকে নানা বিভ্রান্তিকর আলোচনার মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক তৈরি হচ্ছে। কমরেড ফিরোজ বলেন, সরকারের দিক থেকে দ্রুতই গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্য নির্বাচন ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন সংস্কারসহ একটি সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ ঘোষণা করা জরুরি।

শহিদ ডা. মিলন দিবসে বাসদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

দশম পৃষ্ঠার পর

হলেও দীর্ঘ ৩৪ বছরেও মিলন হত্যার সুষ্ঠু বিচার ও গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি।

তিনি ডা. মিলনের স্মৃতি ফলকে শুধু স্বৈরাচারের গুলিতে নিহত ডা. মিলন না লিখে সামরিক স্বৈরাচার এরশাদের লেলিয়ে দেওয়া সন্ত্রাসীদের গুলিতে শহিদি মৃত্যুবরণ করেন ডা. মিলন উল্লেখ করার কথা প্রস্তাব করেন। একইভাবে '৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানের শহিদ আসাদ ও ২০২৪ এর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের গণ অভ্যুত্থানে শহিদ সাঈদ ও শহিদ মুগ্ধের খুনীদের নাম উল্লেখ করার প্রস্তাব করেন। এই শহিদদের যেমন মানুষ শ্রদ্ধায় স্মরণ করবে তেমনি তাদের খুনিদের নাম ঘৃণার সাথে মনে রাখবে।

তিনি আরও বলেন, '৬৯-এ আসাদের মৃত্যু, '৯০-এ মিলনের মৃত্যু আর '২৪ এ সাঈদের মৃত্যু আন্দোনে গতিসঞ্চার করে স্ফুলিঙ্গ রূপ নেয় দাবানলের।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

শহিদ ডা. সামছুল আলম মিলনের ৩৪তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ছাত্র ফ্রন্টে পক্ষ থেকে ২৭ নভেম্বর সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মুক্তা বাড়ৈ, সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক সুহাইল আহমেদ শুভ ও দপ্তর সম্পাদক অনিক কুমার দাসের নেতৃত্বে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

সারা বছর কাজ-খাদ্য ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন প্রতিষ্ঠার দাবি

শেষ পৃষ্ঠার পর

বলেন, কৃষি প্রধান দেশের কৃষকসমাজ–যারা দেশের মানুষের মুখের খাবার তুলে দিয়ে নিজেরা অভুক্ত-অর্ধভুক্ত থাকতে বাধ্য হন, তাদের একটা অংশ নিয়ে রংপুরে এই কৃষক-খেতমজুর ও আদিবাসী সমাবেশ। এই সমাবেশে অংশ নিতে যেসব কৃষক-খেতমজুর আদিবাসীদের কৃষক-কৃষাণী ভালোবাসার আকর্ষণে দায়িত্বের বন্ধনে মুক্তির আকুতিতে কষ্ট স্বীকার করে উপস্থিত হয়েছেন আর তাদের পাশে দাঁড়ানোর মনোভাবে বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ, কৃষক সংগঠনসহ নানা সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতা কর্মীবৃন্দ, সুধীজন উপস্থিত আছেন, আপনাদের সবাইকে আমাদের দলের পক্ষ থেকে জানাই রক্তিম শুভেচ্ছা ও সংগ্রামী অভিনন্দন।

গত ৫ আগস্ট শোষণসৃষ্ট বৈষম্য ও ফ্যাসিবাদ সৃষ্ট দুঃশাসন বিরোধী এক ঐতিহাসিক গণ অভ্যুত্থান বহু ত্যাগ ও প্রাণের বিনিময়ে সংগঠিত হয়েছে। আমি গভীর শ্রদ্ধায় সকল নিহত-আহতদের স্মরণ করছি। বিশেষ করে রংপুরের কৃষক পরিবারের সন্তান, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অকুতোভয় সংগ্রামী শহিদ আবু সাঈদকে স্মরণ করছি। তার সাহসী আত্মবলিদান সংগ্রামের অগ্নিশিখা জ্বালিয়েছিল। অসংখ্য তরুণ-যুবকের মুখে দিয়েছিল ভাষা–'বুকের ভিতর দারুন ঝড়, পেতেছি বুক গুলি কর'–এই প্রত্যয়ে সর্বস্তরের মানুষ অদম্য প্রতিরোধে ব্যর্থ করে দিয়েছিল ফ্যাসিবাদী শক্তির সশস্ত্র হামলা-আক্রমণ। যে ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি, গুলি চালানো পুলিশ দলের একজন তাদের বড় কর্তাকে মুঠোফোনে জানাচ্ছেন–'স্যার, একটাকে গুলি করি, সেটা মরে কিন্তু পাশ থেকে একটাও নড়ে না।' এ ধরনের চিত্র ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে আমাদের ভূখণ্ডের দীর্ঘ লড়াইয়ের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। বিশেষ করে ১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং তৎপরবর্তী ৫৩ বছরের ইতিহাস সে সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু তারপরও আমাদের বিজয় এসেছে অনেকবার কিন্তু মুক্তি আসেনি। কারণ জনতার রক্তে ক্ষমতার পালাবদল হলেও শোষণমূলক ব্যবস্থার বদল হয়নি, জনতার হাতে ক্ষমতা আসেনি। বিদেশি ব্রিটিশ শোষকের হাত থেকে পাকিস্তানি উপনিবেশিক শোষকের হাতে, তাদের হাত থেকে দেশি শোষকদের হাতে ক্ষমতার হাত বদল হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে শাসক-শোষকদের কাগজে লেখা ও কানে শোনা আশ্বাসের বহু বাণীর বিশ্বাস ভঙ্গে জনতার দীর্ঘশ্বাস প্রলম্বিত করেছে। জনযুদ্ধে অর্জিত স্বাধীনতাকে ব্যক্তি ও দল কুক্ষিগত করেছে। সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের গণআকাঙ্ক্ষাকে শাসকশ্রেণি পদদলিত করে উলটো পথে দেশ শাসন করে চলেছে। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও স্বাধীন জাতীয় বিকাশের জাতীয়তাবাদকে বাণিজ্যিক পণ্যের মতো ব্যবহার করেছে। ৫৩ বছরে মানুষ বেসামরিক থেকে সামরিক, সামরিক থেকে বেসামরিক, বহুদল থেকে একদল, একদল থেকে বহুদল, রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার থেকে সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের রং তামাশা দেখেছে। বিশেষ করে গত ১৫-১৬ বছরের একদলীয় কর্তৃত্ববাদী ফ্যাসিবাদী শাসনের শ্বাসরোধ করা পরিবেশে কাটিয়েছে। তার পরিণতিতে বৈষম্য বিরোধী চেতনায় হলো '২৪-এর গণ অভ্যুত্থান।

এখন চলছে অস্থির সময়। চলছে হাত বদলের নানা আয়োজন। নানা গোষ্ঠী ও শক্তি রয়েছে তৎপর, তাদের আশু ও ভবিষ্যৎ স্বার্থ উদ্ধারের মনোযোগে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা অনেকটা উপেক্ষিত। বাজারের আগুনে পুড়ছে মানুষ। একটা উদাহরণ টানা যেতে পারে। শ্রীলঙ্কায়ও একটা গণ অভ্যুত্থান হয়েছিল। একই শাসক পরিবারের হাত বদল হয়েছিল। কিন্তু ২ বছরের মাথায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বামপন্থি কমিউনিস্ট দল জয়ী হয়েছে। ফলাফলে সেপ্টেম্বর ২০২২-এর মূল্যস্ফীতি ঘটেছিল ৬৭ শতাংশ। এখন তা -০.৫ শতাংশে নামানো গেছে। কিন্তু আমাদের দেশে দ্রব্যমূল্য কমছে না, মূল্যস্ফীতি কমছে না, খোড়া যুক্তি চলছে। অহেতুক বিতর্কের পাহাড় জমানো হচ্ছে। প্রতিহিংসা, তাৎক্ষণিক উত্তেজনা, গণ উন্মাদনা সৃষ্ট অরাজকতার কাছে নতি স্বীকার করে সঠিক সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যাবে না। জনগণের প্রকৃত শক্তিকে চিনে নিতে হবে, বৈজ্ঞানিক যুক্তির আলোকে গণবিরোধী ও কুসংস্কারের কালো ছায়া সরাতে হবে। আমাদের এই সমাবেশে আমাদের দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ আলোচনা করবেন। আমি সর্বশেষ বলতে চাই বাংলাদেশে কৃষি শ্রমিকের মধ্যে ৫৮ শতাংশ নারী শ্রমিক। কৃষিতে ২৩ ধরনের কাজের মধ্যে ১৭টি কাজে অংশগ্রহণ করে নারীরা। কৃষিতে নিয়োজিত কিন্তু নারীর নামে জমি না থাকায় কৃষক হিসাবে স্বীকৃতি নাই, কৃষিকার্ড নাই। ফলে সার, বীজ পায় না, কৃষি ঋণ পায় না। এ অবস্থার অবসান ঘটাতে হলে শুধু হাত বদল নয় ব্যবস্থা বদল করতে হবে।

এই বলেই আমি আবারও সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে সমাবেশের সাফল্য কামনা করে সমাবেশের উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ জুলাই-আগস্ট গণ অভ্যুত্থানে নিহত শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা ও লাল সালাম জানিয়ে বলেন, গণ অভ্যুত্থানের স্লোগান উচ্চারিত হয়েছিল—বৈষম্যহীন সমাজ চাই। রাষ্ট্র পরিচালনায় কর্তৃত্ববাদী-ফ্যাসিবাদী, স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অবসান ও অপসারণ করতে চাই। ফ্যাসিবাদের মূলভিত্তি উৎপাটন করতে হবে। আমাদের দেশে যে শ্রমশক্তি আছে তার ৫৮ ভাগ কৃষি শ্রমের সাথে যুক্ত। ৫৮ ভাগের ৭৪ শতাংশ নারী শ্রমিক। দেশের কৃষক একবার কিনতে ঠকে আরেকবার বেচতে ঠকে। ফসল উৎপাদন করতে গেলে সার-বীজ, কীটনাশক ওষুধ, সেচসহ কৃষি উপকরণ লাগে। এই কৃষি উপকরণের দাম লাগামহীনভাবে ক্রমাগত বেড়ে চলছে। এর ফলে উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। অথচ কৃষক ফসল বিক্রয় করতে গেলে লাভজনক দাম পায় না। ফলে তারা ক্রমাগত জমি হারিয়ে মাঝারি কৃষক গরিব কৃষকে পরিণত হয়, গরিব কৃষক প্রান্তিক কৃষকে পরিণত হয়, প্রান্তিক কৃষক ভূমিহীন-খেতমজুরে পরিণত হয়। এভাবে ক্রমাগত নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়া চলছে গত ৫৩ বছর ধরে।

তিনি বলেন, ফসলের লাভজনক দাম দিতে হবে। স্বল্প সুদে সহজ শর্তে, হয়রানি, দুর্নীতি বন্ধ করে কৃষকদের কৃষি ঋণ প্রদান করতে হবে। এ দাবি এখনও পূরণ হয়নি। এক দেশ দুই নীতিতে চলছে। এখানে যারা ধনী-লুটপাটকারী তারা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে যদি ফেরত নাও দেয় তাদের সালাম দেওয়া হয়, সম্মান দেওয়া হয়। রাষ্ট্রের কর্তা ব্যক্তিরা বিদেশে গেলে তাদের সফর সঙ্গী করা হয়, রাষ্ট্রীয় ভোজ সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়। আর কৃষকরা ৫-১০ হাজার টাকা কৃষি ঋণ নিয়ে খরা-বন্যায় তাদের ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে তারা যখন সময় মতো ঋণ পরিশোধ করতে পারে না তখন তাদের কোমরে রশি বেঁধে থানা হাজতে ও জেলে নিয়ে সাজা দেওয়া হয়, টাকা পরিশোধ করতে বাধ্য করে।

তিনি বলেন, যারা দেশে উৎপাদন করে তাদের খাদ্যের কোন প্রকার নিরাপত্তা নাই। কৃষক- খেতমজুরদের সারা বছরের কাজ ও খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গ্রাম-শহরের গরিব মানুষের জন্য আর্মি রেটে রেশনিং ব্যবস্থা চালু এবং কর্মসৃজন প্রকল্প চালু করতে হবে। দেশের প্রায় ৫০টি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী আছে, তাদের ভূমির অধিকার নিশ্চিত করতে হবে, এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবনের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

দেশের গরিব কৃষক, ক্ষুদ্রচাষি, মাঝারি কৃষক, ভূমিহীন, দিনমজুর। এদের জন্য সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এদের জন্য যতটুকু বাজেট বরাদ্দ হয় তা নিয়ে দুর্নীতি হয়, দলীয়করণ ও লুটপাট হয়। আমরা এগুলো বন্ধের দাবি করছি এবং প্রকৃত দুস্থদের জন্য বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে। সামাজিক সুরক্ষার জন্য যে খাত আছে তার মধ্যে একটা শুভঙ্করের ফাঁকি আছে। সেটা হলো সরকারি চাকরি থেকে যারা অবসরে গেছেন তাদের পেনশনের টাকাকে সামাজিক সুরক্ষার সাথে যুক্ত করে দেখানো হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানি ভাতাকেও এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে। সব মিলিয়ে ৯ ধরনের কর্মসূচির আওতায় ১১৫টির অধিক খাত এর সাথে যুক্ত করা আছে। ২০২৩-২৪ সালের প্রস্তাবিত বাজেটে ১ লাখ ২৬ হাজার ২৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে যা বাজেটের ১৬ দশমিক ৫৮ শতাংশ এবং মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ২ দশমিক ৫২ শতাংশ। এত বিশাল বরাদ্দ দেখানো হলেও এক জন বিধবা কত টাকা পায়? একজন বয়স্ক মানুষ কত টাকা পায়? খুবই নগণ্য।

দেশের মানুষ ফ্যাসিস্ট শাসককে দেশ ছাড়া করেছে। শ্রীলঙ্কার রাজা পাকসে দেশ থেকে পালিয়ে সিঙ্গাপুরে গিয়ে ই-মেইলে পদত্যাগ করেছেন। সেখানে দুই বছর পর এখন নির্বাচনে বামপন্থি প্রেসিডেন্ট জয়ী হয়েছে। সে দেশের মূল্যস্ফীতি ছিল ৬৭ শতাংশ, এখন তা কমে দাঁড়িয়েছে মাইনাস শুন্য দশমিক পাঁচ শতাংশে। এটা কীভাবে হলো? এটা হয়েছে রাজনৈতিক দর্শনের কারণে। যখন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয় জনগণের মঙ্গল করা তখন অবস্থা এমন হয়। আর যদি ক্ষমতায় যায় ধনিক শ্রেণির রাজনৈতিক দল তখন তাদের কাছে জনগণ প্রধান হয় না। প্রধান হয় লুটপাট ও ধনিকশ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করা। আমাদের দেশের মানুষ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ২০০ বছর লড়াই করেছে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ২৩ বছর। ১৯৭১ সালে দেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে। ৯ মাসের লড়াইয়ে ৩০ লাখ মানুষ জীবন দিয়েছে, ২ লাখ মা-বোন সম্ভ্রম হারিয়েছে। তার মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি। আমরা পাকিস্তানি প্রায় ওপনিবেশিক শাসন-শোষণের হাত থেকে মুক্তি চেয়েছিলাম। আমরা এমন দেশ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম যেখানে মানুষের ঘর থাকবে তারা বস্তিতে-রেল লাইনের পাশে ঝুপড়িতে ফুটপাতে ঘুমাবে না। মানবেতর জীবনযাপন নয়, মনুষ্যত্ব নিয়ে মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করবে। সকল মানুষ যাতে সুবিচার পায়, সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা পায় এমন একটা সমাজ নির্মাণ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমরা গত ৫৩ বছর ধরে দেখলাম এখানে ধনিকশ্রেণির রাজনৈতিক দল রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন নামে। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী এরা দেশ শাসন করেছে। এরা কেউই স্বাধীনতার চেতনার ভিত্তিতে জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করেনি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ভূ-লুণ্ঠিত করেছে। তাই এখানে এক দল লুটেরা গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে যারা জনগণের সম্পদ লুণ্ঠন করে নিজেদের পকেট ভারী করেছে। দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার করছে। সুইস ব্যাংকে টাকা জমাচ্ছে। পাকিস্তানিরা আমাদের শোষণ করে দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করে নিজ দেশ পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গিয়েছে। আর আমাদের দেশের ধনীরা দেশের সম্পদ লুটপাট করে বিদেশে পাচার করে। আবার এরা নিজেদের দেশপ্রেমিক দাবি করে।

'২৪-এর গণ অভ্যুত্থানে স্লোগান ছিল বৈষম্যহীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার। অর্থাৎ বৈষম্যহীন সমাজের স্বপ্ন নিয়ে গণ অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়েছে। এই গণ অভ্যুত্থানে অকাতরে ছাত্র-শ্রমিক সাধারণ মানুষ জীবন দিয়েছে। ছাত্র সমাজ এই অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিয়েছে আর সাধারণ মানুষ তাতে শামিল হয়েছে। সমন্বয়কদের পছন্দমতো মানুষকে নিয়ে অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়েছে। বলেছিল রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে পরামর্শ করে সরকার গঠন করবে কিন্তু তারা তা করেনি। তারপরও আমরা আমাদের দল এবং আমাদের বাম গণতান্ত্রিক জোট এই সরকারকে সমর্থন দিয়েছিলাম। কিন্তু আমরা বলছি এটা নিঃশর্ত সমর্থন নয়। শর্ত হচ্ছে বৈষম্য বিরোধী যে চেতনা সে অনুযায়ী কাজ করলে আমরা সমর্থন দিয়ে যাব আর তার বিপরীতে কাজ করলে আমরা তার বিরোধিতা করবো। জনগণকে সাথে নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলবো।

তিনি আরও বলেন, প্রায় তিন মাস অন্তবর্তীকালীন সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করছে। আমরা বলছি এই সরকারের প্রধান কাজ হবে জুলাই-আগস্টে গণ অভ্যুত্থানে যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে তাদের তালিকা করতে হবে। বিশেষ ট্রাইব্যুনালে হত্যার বিচার করতে হবে। শহিদদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আহতদের তালিকা প্রণয়ন করতে হবে এবং তাদের চিকিৎসার ও পুনর্বাসনের দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। কিন্তু আমরা দেখলাম তারা তাদের প্রধান কাজে মনোযোগ না দিয়ে নানা বিভ্রান্তিকর বক্তব্য-বিবৃতি দিয়ে জনগণের মধ্যে বিতর্ক ও বিভক্তি সৃষ্টি করছে। আন্দোলনকারী শক্তির মধ্যে বিভেদ তৈরি করছে। আমরা বলছি বাংলাদেশের মানুষ যেমন কাউকে তুলতে পারে আবার তাকে টেনে-হিঁচড়ে নামাতেও সময় লাগে না। আমরা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করছি, গণ অভ্যুত্থানের চেতনার বিরুদ্ধে কাজ করবেন না। গণ অভ্যুত্থানের চেতনার পক্ষে কাজ করতে হবে। আজকে নতুন প্রজন্মের কাছে কেউ কেউ উত্থাপন করতে চায় এটা নাকি দ্বিতীয় স্বাধীনতা! আবার কেউ বলছেন এটা বিপ্লব! আমরা বলতে চাই স্বাধীনতা মানে হচ্ছে, উপনিবেশিক শক্তির হাতে থাকা দেশকে মুক্ত করা, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। যেমন, ১৯৭১ সালে যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানিদের হটিয়ে দেশকে প্রায়-উপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত করেছি এটা হচ্ছে স্বাধীনতা। আজকে আপনারা কোন উপনিবেশিক শক্তির হাত থেকে দেশকে স্বাধীন করলেন। এই ধরনের বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য কেন দিচ্ছেন? আরও কথা উঠেছে–এটা কী গণ অভ্যুত্থান, না বিপ্লব। বিপ্লব কথার অর্থ কী? জনগণের সর্বাত্মক অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শাসকশ্রেণিকে উৎখাত করে জনসাধারণের অধিকাংশের অংশগ্রহণ ও সমর্থনপুষ্ট অন্য আরেক শ্রেণির রাষ্ট্রক্ষমতা দখল এবং সামাজিক সম্পর্কসমূহের গুণগত পরিবর্তনই বিপ্লব। এর মানে হচ্ছে একটা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। এক শ্রেণির হাত থেকে আরেক শ্রেণির হাতে ক্ষমতায় যাওয়া। যেমন, ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর কমরেড লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি বুর্জোয়া শ্রেণিকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করে সর্বহারা শ্রেণি রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে। এটা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। ফলে জুলাই-আগস্টের গণ আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশে দ্বিতীয় স্বাধীনতা লাভ করেনি বা কোন বিপ্লবও ঘটেনি। স্রেফ গণ অভ্যুত্থান হয়েছে, একই শ্রেণির মধ্যে ক্ষমতার হাত বদল হয়েছে মাত্র। এ ভূখণ্ডে আরও গণ অভ্যুত্থান হয়েছে ১৯৬৯ এবং '৯০ সালে। তবে এবারের অভ্যুত্থানের মধ্যে কিছু বিপ্লবী উপাদান রয়েছে। আমরা বলেছি, এটাকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা বা অন্য নাম দিয়ে নতুন প্রজন্মের চেতনা এবং তাদের আবেগকে কাজে লাগিয়ে তাদের অপব্যবহার করবেন না। তাদের ভিন্নখাতে পরিচালিত করলে সেটা হবে খুবই দুঃখজনক।

কমরেড ফিরোজ বলেন, গণমাধ্যমে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে অন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন 'ছাত্ররা রিসেট বাটন পুশ করেছে'। এর মধ্যদিয়ে তিনি কী বুঝাতে চেয়েছেন? এ বক্তব্যের মধ্যদিয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধকে মুছে ফেলার স্পর্ধা দেখিয়েছেন। আমাদের

এর পর পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ১

আলু বীজ সরবরাহে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিকারী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন

সার-কীটনাশকসহ কৃষি উপকরণ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সরবরাহ কর

বাসদ বগুড়া জেলা

আলু বীজ সরবরাহে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিকারী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, সার-কীটনাশকসহ কৃষি উপকরণ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে স্বল্পমূল্যে প্রকৃত কৃষকদের সরবরাহ করা এবং দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ; শ্রমজীবীদের জন্য আর্মিরেটে রেশনের দাবিতে-বাসদ বগুড়া জেলা শাখার উদ্যোগে ২১ নভেম্বর সাতমাথায় মানববন্ধন-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বাসদ বগুড়া জেলা আহ্বায়ক কমরেড অ্যাড. সাইফুল ইসলাম পল্টুর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন জেলা সদস্যসচিব অ্যাড. দিলরুবা নূরী, সদস্য সাইফুজ্জামান টুটুল, শহিদুল ইসলাম, নিয়তি সরকার নিতু প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, এখন আলু লাগানোর ভরা মৌসুম চলছে। এই সুযোগে একদল অসৎ ব্যবসায়ী আলু বীজসহ অন্যান্য বীজ সরবরাহে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। সরকারি তদারকি না থাকায় এরা কৃষকদের জিম্মি করে অতি মুনাফা করে নিচ্ছে। এদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। কৃষককে বাঁচাতে সার, কীটনাশকসহ কৃষি উপকরণ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করতে হবে।

নূর হোসেন দিবস পালিত

স্বৈরাচারের ভিত্তিমূল উৎপাটন করতে হবে

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ-এর উদ্যোগে ১০ নভেম্বর দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজের নেতৃত্বে নূর হোসেন চত্বরে পুষ্পমাল্য প্রদান করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন দলের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নিখিল দাস, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জুলফিকার আলী, বর্ধিত ফোরামের সদস্য মাঈনউদ্দীন চৌধুরী, খালেকুজ্জামন লিপনসহ নেতাকর্মীরা।

নূর হোসেন স্কোয়ারে গণমাধ্যমে দেওয়া বক্তৃতায় কমরেড ফিরোজ বলেন, সামরিক স্বৈরশাসক এরশাদ মানুষের মৌলিক অধিকার কেড়ে নিয়েছিল। এর বিরুদ্ধে দেশের আপামর জনসাধারণ সোচ্চার হয়। সামরিক শাসনের অবসানের লক্ষ্যে চলমান আন্দোলনের এক পর্যায়ে ১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর ৮ দল, ৫ দল ও ৭ দল তিন জোট সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচি পালন করেছিল। নূর হোসেন নিজের বুকে 'স্বৈরাচার নিপাত যাক' পিঠে 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক' লিখে মিছিলে অংশ নেয়। সে মিছিল জিরো পয়েন্ট অতিক্রমের সময় তৎকালীন বিডিআর মিছিলে গুলি চালালে নূর হোসেন গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে। ৩৭ বছর আগে গণতন্ত্রের জন্য নূর হোসেন জীবন দিলেও দেশে গণতন্ত্র মুক্তি পায়নি। নূর হোসেনের স্বপ্ন এখনও বাস্তবায়ন হয়নি, নিশ্চিত হয়নি জনগণের মৌলিক অধিকার। জনগণ স্বৈরাচারের পতন ঘটায় কিন্তু ব্যবস্থার কারণে বারবার ফিরে আসে স্বৈরতন্ত্র। ২০২৪ সালে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে মানুষের অধিকারের দাবিতে ছাত্র-জনতার সম্মিলনে গণ অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়। মানুষ নতুন করে স্বপ্ন দেখছে বৈষম্যের বিরুদ্ধে নতুন রাষ্ট্রের। যার মধ্যদিয়ে ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে, গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত হবে। নূর হোসেন যেমন অধিকারের দাবিতে জীবন দিয়েছিল এবছরও হাজারো মানুষ অধিকারের দাবিতে জীবন দিয়ে অগণতান্ত্রিক, ফ্যাসিস্ট আওয়ামী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে। স্বৈরাচারের ভিত্তিমূল উৎপাটন না করলে এই ব্যবস্থা মানুষের কাধে দৈত্যের মতো এসে চেপে বসবে। আমরা ব্যবস্থা বদলের আন্দোলন করে যাচ্ছি, জনগণকে এতে শামিল হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা নূর হোসেনসহ আন্দোলনে সকল শহিদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

চট্টগ্রামে আইনজীবী হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার চাই

সারাদেশে সাম্প্রদায়িক উসকানি, উন্মাদনা ও হামলা রুখে দাঁড়াও

চট্টগ্রামে আইনজীবী সাইফুল ইসলাম-এর হত্যার ঘটনার সাথে যুক্তদের গ্রেপ্তার ও বিচার, সারাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা, উসকানি দাতাদের চিহ্নিত করে বিচারের দাবিতে বাসদের উদ্যোগে ২৭ নভেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জুলফিকার আলীর সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য প্রকৌশলী সম্পা বসু ও কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত ফোরামের সদস্য খালেকুজ্জামন লিপন। সমাবেশের পরে মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, জুলাই-আগস্টের গণ অভ্যুত্থানের চেতনা ছিল বৈষম্যবিরোধী। ধর্মীয় বৈষম্য, অর্থনৈতিক বৈষম্য, নারী-পুরুষের বৈষম্যসহ সমাজে বিরাজমান সকল বৈষম্যের অবসান। কিন্তু সে চেতনা এবং অর্জনকে ধ্বংস করার জন্য দেশে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র চলছে। দেশবাসী শহিদের রক্ত ব্যর্থ হতে দিবে না। ৫ আগস্টের পর থেকে নানা গোষ্ঠী ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে সংখ্যালঘুদের মন্দির, বাড়িঘরে হামলা করছে, মাজার-আখড়া ভাঙচুর করেছে, মনীষীর চিত্রে কালিলেপন করছে। বাম গণতান্ত্রিক জোট, বাসদ-সিপিবির সমাবেশে হামলা করে ভাঙচুর করছে। সংবাদপত্রের অফিসে ভাঙচুর করেছে। নির্মমভাবে মানুষকে খুন করছে। এর মধ্যদিয়ে গণহত্যাকারী ফ্যাসিবাদী শক্তি ও মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি দেশে একটা অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করার চেষ্টা করছে। ফলে এই গণ-শত্রুদের চিহ্নিত করে বিচার করতে হবে। অভ্যুত্থানের বিজয়কে অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, চট্টগ্রামে প্রকাশ্যে একজন আইনজীবীকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যা করা জঘন্য অপরাধ। এর সাথে যুক্তদের গ্রেপ্তার করে বিচারের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক সাজা দিতে হবে এবং সারাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য সকল দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক মানুষকে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

শহীদ ডা. মিলন দিবসে বাসদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

২৭ নভেম্বর '৯০-এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের বীর শহিদ ডা. সামছুল আলম মিলন দিবস। বাসদ এর উদ্যোগে ঢাকা মেডিকেল কলেজ গেট সংলগ্ন ডা. মিলনের সমাধিতে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সংলগ্ন মিলনের স্মৃতি স্তম্ভ (নিঝুম)-এ শ্রদ্ধা জানিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। শ্রদ্ধাঞ্জলিকালে উপস্থিত ছিলেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, আরও ছিলেন নিখিল দাস, জুলফিকার আলী, খালেকুজ্জামান লিপন, মাঈন উদ্দিন চৌধুরী প্রমুখ।

শ্রদ্ধাঞ্জলি শেষে ঢাকা মেডিকেল কলেজ শিক্ষক সমিতি আয়োজিত আলোচনাসভায় কমরেড রতন বলেন, ১৯৯০ সালের এই দিনে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন সামরিক জান্তার লেলিয়ে দেওয়া সন্ত্রাসীদের গুলিতে শহিদি মৃত্যুবরণ করেন ডা. মিলন। ডা. মিলনের শহিদি আত্মদানের মাধ্যমে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন বেগবান হয় এবং ৬ ডিসেম্বর ছাত্র-জনতার গণ অভ্যুত্থানে সামরিক জান্তা স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতন ঘটে। কিন্তু স্বৈরাচারের পতন

এরপর পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

সংস্কার ও নির্বাচন নিয়ে দ্রুত রোডম্যাপ ঘোষণা করতে হবে

বজলুর রশীদ ফিরোজ

[বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানপরবর্তী রাজনীতি ও অন্তর্বর্তী সরকারের নানা উদ্যোগ ও সংস্কার কার্যক্রম নিয়ে প্রথম আলোর সঙ্গে কথা বলেছেন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মনজুরুল ইসলাম, যা ২১ অক্টোবর ২০২৪ সংখ্যায় ছাপা হয়। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় তাঁর সাক্ষাৎকারটি মাসিক ভ্যানগার্ড-এ পুনঃমুদ্রণ করা হলো। –সম্পাদক।]

প্রথম আলো : আপনারা দীর্ঘদিন ধরে সুষ্ঠু নির্বাচন ও সরকার পতনের দাবিতে আন্দোলন করছিলেন। ২০২৪ সালে এসে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী শাসনের পতন হলো। এই গণ অভ্যুত্থানের রাজনৈতিক তাৎপর্য কী?

বজলুর রশীদ ফিরোজ : যেকোনো সাফল্যের পেছনে মানুষের শ্রম থাকে, সংগ্রাম থাকে, তেমনি রাজনৈতিক আন্দোলনের সাফল্যের পেছনেও থাকে দীর্ঘদিনের লড়াই। দুর্নীতি, দুঃশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন তো ছিলই, এর সঙ্গে নির্বাচনী ব্যবস্থা ধ্বংস করা নিয়ে মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ছিল। ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ এই তিনটি নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ভোটাধিকার হরণ করা হয়েছিল।

এর বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলো দীর্ঘদিন আন্দোলন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালে এসে ছাত্র-জনতা-শ্রমিকের সফল অভ্যুত্থানে ফ্যাসিবাদী শাসনের পতন হয়েছে। শুধু ৩৬ দিনের আন্দোলনেই গণ অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে-এভাবে ভাবাটা ঠিক নয়।

এই অভ্যুত্থানে দুটি বিষয় গণ আকাঙ্ক্ষারূপে হাজির হয়েছে। একটি হলো বৈষম্যবিরোধিতা; অপরটি ফ্যাসিবাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রশাসনিক মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি অপসারণ। এই অভ্যুত্থানের শ্রেণিগত সক্ষমতার প্রশ্ন রয়েছে। তবে এর রাজনৈতিক তাৎপর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী।

প্রথম আলো : গণ অভ্যুত্থানের পর অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছে। এই সরকার দায়িত্ব নেওয়ার দুই মাস পেরিয়ে গেছে। এই সরকারের কর্মকাণ্ডকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

বজলুর রশীদ ফিরোজ : সামগ্রিক পরিস্থিতির অস্বাভাবিকতা ও অরাজকতা কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে যতটা মনোযোগ প্রয়োজন ছিল, অন্তর্বর্তী সরকার সেটা দিতে পেরেছে বলে মনে হয় না। দুই মাস যদিও যথেষ্ট সময় নয়, তবু দ্রব্যমূল্য, বাজার পরিস্থিতি ও শ্রমজীবী দরিদ্র জনজীবনের দুর্দশা লাঘবে ব্যর্থতা স্পষ্ট। সরকারের কাজের সমন্বয়হীনতা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের অগ্রাধিকার নির্ধারণে অস্পষ্টতা রয়েছে।

প্রথম আলো : বর্তমানে বহুল আলোচিত একটি শব্দ হলো সংস্কার। অন্তর্বর্তী সরকারও সংস্কারের কথা বলছে। এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছে। এসব কমিশনের কাছে আপনাদের প্রত্যাশাগুলো কী?

বজলুর রশীদ ফিরোজ : এই কমিশনগুলো সমস্যা পুরোপুরি সমাধান করবে না; তবে সমাধানের কিছু পথ দেখাবে—জনগণ এমন প্রত্যাশা করে। আমরা মনে করি, রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে সংকট চিহ্নিত করা, সমাধানের পথ নির্দেশ করা এবং খানিকটা দূর করার উদ্যোগ নেবে কমিশনগুলো।

তবে মীমাংসিত বিষয়ে নতুন বিতর্কও যেন সংকটের জন্ম না দেয়, সে ব্যাপারে কমিশনকে সতর্ক থাকতে হবে। বিভিন্ন সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে সংস্কারের রূপরেখা, পরিধি-সময়সীমা ইত্যাদি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা না হওয়ায় পুরো বিষয়টি এখনো অন্ধকারে রয়েছে।

প্রথম আলো : সংবিধান পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আপনাদের অবস্থান কী? বাহাত্তরের সংবিধানের সংশোধন না নতুন সংবিধান প্রণয়ন—আপনাদের দাবি কোনটা?

বজলুর রশীদ ফিরোজ : ৫২ বছর ধরে যারা দেশ শাসন করেছে, ক্ষমতার স্বার্থে তারা মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত সংবিধানকে অস্বীকার করেছে কিংবা পাশ কাটিয়েছে অথবা বিকৃত করে গোঁজামিলের দলিলে পরিণত করেছে। আপাতত অগণতান্ত্রিক সংশোধনীগুলো বাতিল করে বিভিন্ন জাতিসত্তার স্বীকৃতি, সম্পত্তির উত্তরাধিকারে নারীর সমানাধিকার, মৌলিক অধিকারের আইনি সুরক্ষা, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা এবং ৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল করে সংশোধন করলেই চলবে বলে মনে হয়। একটি সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচনসহ প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থার ন্যূনতম সংস্কার করার চেয়ে এই সরকারের বেশি কিছু করা উচিত হবে না।

প্রথম আলো : কোনো কোনো দল আগে নির্বাচন, পরে সংস্কার—এমন কথা বলেছে। রাজনৈতিক সংস্কার নিয়ে আপনার মতামত জানতে চাই।

বজলুর রশীদ ফিরোজ : সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য কাগজে-কলমে সংস্কারই যথেষ্ট নয়; সামগ্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন জরুরি। আগে-পরের বিষয় নয়, স্বচ্ছ ও যৌথ মতামত বের করে আনার চেষ্টা করতে হবে। এ জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রয়োজনীয় আলোচনার মাধ্যমে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আগে-পরে এই বিতর্কে জড়িয়ে সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কোনো লাভ হবে না।

সংস্কার ও নির্বাচন-একটা অপরটার বিরোধী নয়; কিন্তু আলোচনাটা এমনভাবে হচ্ছে যেন একটা করলে আরেকটা করা যাবে না। দুটিই সমান্তরালভাবে করতে হবে। সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য যতটুকু সংস্কার, ততটুকু করে দ্রুত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরই অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান কাজ।

দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন নয়-বিষয়ে সব দল একমত। নির্বাচনকে টাকা, সাম্প্রদায়িকতা ও পেশিশক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে হবে। 'না' ভোটের বিধান, সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনসহ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালুর জন্য যতটুকু সংশোধন প্রয়োজন, ততটুকুই সংস্কার করা দরকার।

প্রথম আলো : সংস্কারের জন্য সরকারকে কত সময় দিতে চান? কত দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে সেটা যৌক্তিক হবে বলে মনে করেন?

বজলুর রশীদ ফিরোজ : অন্তর্বর্তী সরকারকে কোনো সময় বেঁধে দিতে চাই না। তবে তাদেরকে অনির্দিষ্টকাল সময় দেওয়াও ঠিক হবে না। সরকারের পক্ষ থেকে সংস্কার ও নির্বাচন নিয়ে দ্রুতই একটি রোডম্যাপ ঘোষণা করা দরকার। না হলে জনমনে সন্দেহ তৈরির অবকাশ থেকে যাবে।

লালন ফকিরের ১৩৫তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠিত

লালন চিন্তার আলোকে শোষণ-বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ নির্মাণের প্রত্যয়

চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

বাউল সাধক লালন ফকিরের ১৩৫তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে ২৫ অক্টোবর '২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বোপার্জিত স্বাধীনতা চত্বরে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়।

'দ্রোহে প্রতিরোধে লালন'-এই শিরোনামে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি নিখিল দাস। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেনের সঞ্চালনায় আলোচনা করেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, বিবর্তন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমান লাল্টু, সংগঠনের সহসভাপতি শাহজাহান কবীর ও কামরুজ্জামান ভূঁইয়া প্রমুখ।

আলোচনাসভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, লালন এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। রাজা রামমোহান রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরসহ অনেক মনীষী ভারতবর্ষের নবজাগরণ যাদের হাত ধরে শুরু হয়েছিলো তারা ইউরোপের রেঁনেসার সৃষ্টিকর্মের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। কিন্তু লালন এই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাক্ষাৎ পাননি। তাহলে তার গভীর তত্ত্বজ্ঞানের উৎস কী? সেটি হলো সমাজের ব্রাত্যজনের চলমান অন্তস্রোতের ভাবসম্পদ। বৌদ্ধ সহজিয়া, সুফিবাদী চিন্তা ও বৈষ্ণব মতের যে মিথস্ক্রিয়ায় বাউল চিন্তা গড়ে উঠে তা সমাজ দেহে একটি শক্তিশালী মতাদর্শ নির্মাণ করে, যেটি লালন ধারণ করেছিলেন। তিনি বাউল চিন্তার আলোকে জাত-পাত, ধর্মীয় বৈষম্যের বিরুদ্ধে মানবতার জয়গান গেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক চেতনার একজন লোক দার্শনিক।

নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, গত ৫ আগস্ট ২০২৪ গণ ভ্যুত্থানে প্রায় দেড় হাজারের উপর ছাত্র-শ্রমিক-জনতার জীবন উৎসর্গের বিনিময়ে আওয়ামী ফ্যাসিবাদী সরকারের পতন হয়েছে। ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই হলেও আমরা দেখেছি, উগ্র সাম্প্রদায়িক অপশক্তি মাজার-মন্দির, পীরের দরগা, লালনের আখড়া, মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য আক্রমণ, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ করে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটিয়েছে। শুধু তাই নয়, কথিত ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত ও ধর্ম অবমাননার অভিযোগে মব কিলিং ঘটিয়েছে। এই উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর হুমকিতে নতজানু হয়ে সরকার পাঠ্য পুস্তক সংশোধিত ও পরিমার্জনের জন্য গঠিত সমন্বয় কমিটি বাতিল করেছে। এছাড়া কক্সবাজারে নারী লাঞ্ছনা, মব ট্রায়ালের নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মানসিক ভারসাম্যহীন তোফাজ্জলকে হত্যা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শামীমসহ বিভিন্ন ঘটনায় দেশবাসী উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কিত।

নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের কেন্দ্রীভূত চেতনা সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার যা স্বাধীনতার ঘোষণায় বলা হয়েছিল এবং স্বাধীনতাত্তোর সংবিধানে মূলনীতি হিসেবে সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবমুক্ত স্বাধীন জাতীয় বিকাশের অর্থে জাতীয়তাবাদের বিপরীতে বিগত ৫২ বছর ধরে শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৫ বছরে আওয়ামী ফ্যাসিবাদ তৈরি হয়েছে। কেউ কেউ আওয়ামী ফ্যাসিবাদের উৎস হিসেবে '৭২ এর সংবিধানকে অভিযুক্ত করেছে। এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। '৭২ এর সংবিধান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহিদের আত্মদান ও ২ লাখ মা বোনের সম্ভ্রম হারানো জমিন থেকে উঠে আসা। এটি জনযুদ্ধের সংবিধান, মুজিবীয় সংবিধান নয়। সুতরাং যারা '৭২ এর সংবিধানকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার কথা বলেন, তারা হয়তো অজ্ঞতাবশত বা দুরভিসন্ধিমূলকভাবে বলেন। অনেকের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধকে অবজ্ঞার প্রবণতা দেখা যায়। এর মধ্য দিয়ে আমরা পতিত ফ্যাসিস্ট সরকারেরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। এটি জনগণের কাম্য নয়।

নেতৃবৃন্দ লালন দর্শনের আলোকে শোষণ-বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ নির্মাণের সংগ্রামে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। আলোচনাসভা শেষে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের শিল্পীরা লালন সংগীত পরিবেশন করেন।

বাসদের ৪৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ১০৭তম বার্ষিকী উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন জেলায় সভা-সমাবেশ ও লাল পতাকা মিছিল অনুষ্ঠিত হয়

বরিশাল

চট্টগ্রাম

সিলেট

মাগুরা

সিরাজগঞ্জ

জামালপুর

গাজীপুর

বাসদের ৪৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ১০৭তম বার্ষিকী উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন জেলায় সভা-সমাবেশ ও লাল পতাকা মিছিল অনুষ্ঠিত হয়

নারায়ণগঞ্জ

খুলনা

কুষ্টিয়া

নওগাঁ

জয়পুরহাট

কুড়িগ্রাম

ফেনী

হবিগঞ্জ

সারা বছর কাজ-খাদ্য ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন প্রতিষ্ঠার দাবি

নবম পৃষ্ঠার পর

দেশের মানুষ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ২০০ বছর সংগ্রাম করেছে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে, সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণে জনযুদ্ধ তথা মুক্তিযুদ্ধে তাদের সংগ্রামী চেতনা এবং দীর্ঘদিনের সংস্কৃতি-ইতিহাস, ঐতিহ্য এগুলো রিসেট বাটন পুশ করে মুছে দেওয়া যায় না। সমাজ বিকাশের নিয়কে এইভাবে পড়তে চাইলে ভুল হবে।

কমরেড ফিরোজ আরও বলেন, বিগত সরকারের মতো বর্তমান সরকারও এখন পর্যন্ত দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। হাসিনা ও তার সাথে যুক্ত ব্যবসায়ীর নাই, তাহলে আজকে সিন্ডিকেট কারা গড়ে তুলেছে? নতুন সিন্ডিকেট জিনিসপত্রের দাম বাড়াচ্ছে? আপনাদের হাতে পুলিশ ও প্রশাসন। দ্রব্যমূল্য কেন নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন নাই? আমরা শেখ হাসিনার সময় দেখেছি দ্রব্যমূল্য বেড়ে গেলে সরকার ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে শুল্ক কমিয়ে দিয়েছিল। তাতে জিনিসপাতির দাম কমেনি। ব্যবসায়ীরা লাভবান হয়, তাদের মুনাফা বাড়ে, জনগণ কোন উপকার পায় না। এই সরকারও আমদানি শুল্ক কমিয়েছে কিন্তু জনগণ লাভবান হয়নি ব্যবসায়ীরাই লাভবান হচ্ছে। জনগণের মনে প্রশ্ন, তাহলে আপনারা শেখ হাসিনা সরকারের চেয়ে ভালো কী করেছেন? শেখ হাসিনা পদত্যাগের আগে ব্যবসায়ীদের সাথে বৈঠক করলেন এবং বললেন শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে হবে। তখন ব্যবসায়ীরা বললেন তারা শেখ হাসিনার সাথে থাকবে। আপনারা ক্ষমতায় এসেছেন প্রায় তিন মাস হতে চলছে কিন্তু যে চিহ্নিত সিন্ডিকেট দ্রব্যমূল্য বাড়িয়েছিল এখনও তাদের কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি বিচার করাও হয়নি। যারা ব্যাংকের টাকা মেরে বিদেশে পাচার করেছে—এস আলম গ্রুপ, সামিট গ্রুপ, এরকম অনেক আছে আপনারা এদের গ্রেপ্তার করতে পারেন নাই? এগুলো না করতে পারলে আপনাদের ব্যর্থতার তালিকা দীর্ঘ হবে। যে ব্যবসায়ী-সিন্ডিকেট আওয়ামী লীগের ছত্রছায়ায় লুটপাট চালিয়েছে তারা এই সরকারের ছায়া তলে আশ্রয় নিতে শুরু করেছে।

যখন যে সরকার আসে তার ছত্রছায়ায় থেকে ব্যবসায়ীরা জনগণের পকেট কাটে। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি জানান তিনি।

কমরেড ফিরোজ বলেন, শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের মন্ত্রী-এমপি ও নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে এবং তাদের সাথে জোটে থাকা দলগুলোর নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে এখন গণহারে মামলা হচ্ছে। আওয়ামী লীগের হয়ে কাজ করেছে এমন পুলিশের কর্মকর্তার বিরুদ্ধেও মামলা হয়েছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন মন্ত্রী-এমপি ও নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। জুলাই-আগস্টের হত্যাকাণ্ডসহ বিভিন্ন অপরাধে যাদের বিরুদ্ধে মামলা হচ্ছে যদি সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা না হয়, তা হলে এসব মামলার গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না এবং অনেকেই রেহাই পেয়ে যাবে। তাই সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই মামলা হওয়া প্রয়োজন।

তিনি বলেন, সরকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করতে পারে নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তোফাজ্জলের মতো একটা নিরীহ মানুষকে সন্দেহবশত নৃশংসভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এ হত্যার বিচার হয়নি। গণপিটুনির মাধ্যমে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মানুষ হত্যা করা হয়েছে। এগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছেন না। দেশের বিভিন্ন স্থানে ডাকাতি, ছিনতাই, চুরি-রাহাজানি বেড়েই চলছে। জনজীবনে স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে না পারলে অভ্যুত্থান বেহাত হয়ে যেতে পারে।

তিনি বলেন, জনগণ বিগত ১৫-১৬ বছর জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ স্থানীয় নির্বাচন তথা জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে ভোট দিতে পারে নাই তাদের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দ্রুত নির্বাচনের আয়োজন করে দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করতে হবে। বস্তুত মানুষ অন্তবর্তী সরকার কোন এজেন্ডা নিয়ে এগুচ্ছে তা বুঝতে পারছে না।

তিনি বলেন, বেশ কিছু জাতীয় দিবস বাতিল করা হয়েছে। ৭ মার্চ, ৪ নভেম্বর সংবিধান দিবস বাতিল করেছেন। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর সংবিধান পাশ করা হয়। শেখ হাসিনা যেমন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে-বিপক্ষের বয়ান দিয়েছে আপনারাও সে রকম ইস্যু তৈরি করে নতুন বিতর্কিত বয়ান নিয়ে আসছেন। একদিকে আপনারা অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ গড়ে তোলার কথা বলছেন অন্যদিকে বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য দিয়ে বিতর্ক উসকে দিচ্ছেন। সরকারের কাজে অন্তর্ভুক্তির নমুনা প্রকাশ পাচ্ছে না।

তিনি বলেন, অন্তবর্তী সরকারকে ব্যর্থ হতে দেওয়া যাবে না। এ সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলাপ-আলোচনার কথা বলছেন। আমাদেরকে দুইবার ডাকা হলো তাদের সাথে আলোচনার জন্য। তারা আমাদের জন্য সময় নির্ধারণ করেছেন মাত্র ৩০ মিনিট। এত কম সময়ে তো কোন কথাই শোনা ও বলা যায় না। বাম জোটের ৬টা পার্টির জন্য সময় রেখেছে আধ ঘন্টা। এই আধ ঘন্টা সময়ে কি রাজনৈতিক আলোচনা করা যায়। এটাতো কুশল বিনিময় করতেই চলে যায়।

তিনি বলেন, সংস্কারের জন্য ১১টি কমিশন করেছেন, সেই কমিশনের রূপরেখা কী? সংবিধান সংশোধনী না পুনর্লিখন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সদস্যরা মুক্তিযুদ্ধ ও সংবিধান সংশোধনী নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করছেন! সংবিধান সংস্কারের জন্য কমিটি করা হয়েছে এর মধ্যে কেউ কেউ আবার বলছেন সংস্কার নয় পুনর্লিখন করতে হবে। এই সংবিধান ছুড়ে ফেলে দিবেন!

আমরা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, মুক্তিযুদ্ধ আওয়ামী লীগের কোনো দলীয় যুদ্ধ ছিল না। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এ লড়াই হয়েছে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ ছিল বাংলাদেশের আপামর মানুষের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে একটা জনযুদ্ধ। যে কারণে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল, 'আমরা বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করণার্থে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র রূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম।' সেই জনযুদ্ধের ফসল আওয়ামী লীগ দলীয়করণ করেছে। আওয়ামী লীগসহ কোন শাসক দলই স্বাধীনতার ঘোষণা বাস্তবায়ন করে নাই। আমরা বলেছি ৭২ এর সংবিধান মূলত, একটা বুর্জোয়া সংবিধান। এর অসম্পূর্ণতা ঘাটতি আছে। এখন সে অসম্পূর্ণতা পূরণ করতে হবে ঘাটতি দূর করতে হবে। ঘাটতি কী? যেমন, বাংলাদেশের সমস্ত জাতিগোষ্ঠী সংবিধানে স্বীকৃতি পায়নি, নারী-পুরুষের সমতার কথা বলা হলেও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা হয়নি, মৌলিক অধিকারকে আইন দ্বারা সুরক্ষিত করা হয়নি।

আমরা বলতে চাই, মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাকে বিসর্জন দিয়ে নয়, বরং তাকে ধারণ করে, গণ অভ্যুত্থানের চেতনাকে যুক্ত করে শাসন কাঠামো তৈরি করতে হবে। এছাড়া অন্যকিছু বাংলাদেশের মানুষ গ্রহণ করবে না।

তিনি বলেন, বেশ কিছুদিন ধরে দেশে সংখ্যালঘুদের উপর হামলা হচ্ছে। ৫ আগস্ট বিকেল থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত অন্তত ১ হাজার ৬৮টি ঘরবাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলার তথ্য পাওয়া গেছে। এর বাইরে হামলা হয়েছে ২২টি উপাসনালয়ে। ৩১ অক্টোবর হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব দীপাবলি ও কালীপূজাকে কেন্দ্র করে ২৬ অক্টোবর মাদারীপুর জেলার ভূরঘাটা এলাকায় ২৫০ বছর ধরে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছিল কুণ্ডুবাড়ির মেলা। সে মেলা বন্ধ করার জন্য ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে দাবি তোলা হয়। প্রশাসন সে মেলা বন্ধ করে দেয় পরে জেলা প্রশাসক আবার দুদিনের জন্য মেলা অনুষ্ঠানের জন্য অনুমতি দেন।

কমরেড ফিরোজ বলেন, পাঠ্যপুস্তক সংশোধন এবং পরিমার্জন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে ১০ সদস্যের কমিটি গঠন করেছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কমিটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সামিনা লুৎফা এবং পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক কামরুল হাসান মামুনের অন্তর্ভুক্তির পর থেকে জামায়াত-হেফাজত ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তি এদের বিরুদ্ধে কুৎসা এবং মিথ্যা প্রচার চালাতে থাকে। তাদের দাবির মুখে নতি স্বীকার করে শিক্ষা ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা সে কমিটি বাতিল করে দেয়। মবের মাধ্যমে মৌলবাদী শক্তি নতুন নতুন দাবি তুলছে আর এই সরকার তা বাস্তবায়ন করছে। এভাবে চললে একটা রাজনৈতিক সংকট ও গণ অভ্যুত্থানের শক্তির মধ্যে বিভক্তি তৈরি হবে।

তিনি বলেন, দেশে একটা প্রবাদ আছে সকালের আকাশ দেখলেই বুঝা যায় দিনটা কেমন যাবে। অভ্যুত্থানে যে মানুষ নতুন ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিল ইতিমধ্যেই তারা হতাশ হতে শুরু করেছে। তাদের কাছে প্রশ্ন এরা দেশটা কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি ধনীদের তোষণ নয় প্রয়োজনীয় কাজের দিকে নজর দিন।

তিনি আরও বলেন, দেশের ৮০ ভাগ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির সাথে যুক্ত। অথচ কৃষকের সমস্যা সমাধানের জন্য কোন কমিশন হয়নি। আমরা দাবি করছি কৃষক, খেতমজুর, আদিবাসীদের সমস্যা সমাধানের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। কৃষি বিষয়ে অভিজ্ঞ, কৃষক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও খোদ কৃষক প্রতিনিধি নিয়ে কৃষি অধিকার রক্ষা কমিশন গঠন করুন। আদিবাসীদের ভূমির অধিকার, জানমালের নিরাপত্তা ও সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে। আমরা আদিবাসী কমিশন গঠনেরও দাবি জানাচ্ছি। তিনি সরকারের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা কর্মপরিধির জাল অনেক বিস্তৃত করে ফেলেছেন সে জাল গুটিয়ে আনুন। গণ অভ্যুত্থানের অন্তবর্তীকালীন সরকার সংবিধান মানলে তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন করা উচিৎ। আমরা বলবো দ্রুত প্রয়োজনীয় সংস্কার সমাপ্ত করে নির্বাচন সম্পন্ন করে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দিন। নির্বাচন নিয়ে কালক্ষেপণ দেশের মানুষ মেনে নিবে না। আপনাদের পরিকল্পনা-রূপরেখা ও ক্ষমতার মেয়াদকাল দেশবাসীকে জানান। নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার ও সংখ্যানুপাতিক সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। অনির্বাচিত সরকার মানুষ বেশি দিন মেনে নিবে না। তিনি কৃষক-খেতমজুর, আদিবাসীদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের সংগ্রাম এগিয়ে নিতে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

বাসদ নেতা কমরেড আবদুর রাজ্জাকের উপর হামলাকারী সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও বিচার দাবি

বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড আবদুর রাজ্জাক এর উপর হামলাকারী সন্ত্রাসীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে বাসদ ঢাকা মহানগর শাখার উদ্যোগে ১০ ডিসেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বাসদ ঢাকা মহানগর শাখার সদস্য খালেকুজ্জামান লিপনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, সদস্য কমরেড জুলফিকার আলী, নগর কমিটির সদস্য নাসিরউদ্দিন প্রিন্স, রোখশানা আফরোজ আশা, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সহসভাপতি কামরুজ্জামান ভূঁইয়া ও ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি মুক্তা বাড়ৈ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, জনতার গণ-অভ্যুত্থানের পর একদল উগ্র সাম্প্রদায়িকগোষ্ঠী কুমিল্লা শিল্প একাডেমির সামনে নওয়াব ফয়জুন্নেছা চৌধুরীর ও মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলামের প্রতিকৃতিতে কালি লেপন করে বিকৃত করে। এ ঘটনার প্রতিবাদে ১০ ডিসেম্বর প্রতিকৃতির কালি মুছতে গেলে কতিপয় দুষ্কৃতিকারী বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও কুমিলা জেলা সমন্বয়ক কমরেড আবদুর রাজ্জাকের উপর হামলা চালিয়ে তাঁকে মারাত্মকভাবে আহত করে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, নবাব ফয়েজুন্নেসা বৃহত্তর কুমিলা জেলার নারী শিক্ষার অগ্রদূত। তিনি শিক্ষা বিস্তারে স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা ও হাসপাতাল নির্মাণসহ সমাজ সংস্কারে বিরাট অবদান রোখে গিয়েছেন। অথচ সেই মহীয়সী নারীর স্মৃতিস্তম্ভে কালিমা লেপন করা হয়েছে ৫ আগস্টের পর। এটা গণ অভ্যুত্থানের চেতনা বিরোধী। অভ্যুত্থানের পর ছাত্র-তরুণ, যুবসমাজ দেয়ালে দেয়ালে গ্রাফিতিতে আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, কৃষ্টি-

এর পর পৃষ্ঠা ২১ কলাম ৪

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের আদেশের বাস্তবায়ন চাই

ব্যাটারি রিকশা চলাচলে হাইকোর্টের আদেশ পুনর্বিবেচনা কর

রিকশা, ব্যাটারি রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদ

হাইকোর্ট কর্তৃক ঢাকা মহানগরে ব্যাটারি রিকশা চলাচলে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে সুপ্রিম কোর্টের আদেশ বাস্তবায়ন ও হাইকোর্টের দেয়া নিষেধাজ্ঞা পুনর্বিবেচনা করার আহ্বান জানিয়ে রিকশা, ব্যাটারি রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদ ঢাকা মহানগর শাখার উদ্যোগে ২৩ নভেম্বর '২৪ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

সংগ্রাম পরিষদ ঢাকা মহানগর শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দাউদ আলী মামুনের সভাপতিত্বে ও অর্থ সম্পাদক রোখশানা আফরোজ আশার সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব বুলবুল, সংগ্রাম পরিষদ কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের আহ্বায়ক খালেকুজ্জামান লিপন, সদস্য এস এম কাদির, ঢাকা মহানগরের উপদেষ্টা আফজাল হোসেন, ঢাকা মহানগর শাখার নেতা সেকান্দর আলী, শাওন, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি মুক্তা বাড়ৈ।

ব্যাটারি রিকশা চলাচলে হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা প্রসংগে সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, আদালত ব্যবহার করে শ্রমিকের জীবিকার উপর আক্রমণ করবেন না। বিকল্প কাজ দিতে না পারলে তাদের কাজ কেড়ে নেয়া তাদের বিপন্ন দশায় ফেলা কোনোভাবেই গ্রহণ যোগ্য হবে না, সেটা মানবিকও হবে না। ঢাকা মহানগরের সর্বত্র গণপরিবহন না থাকায় প্রধান সড়ক বাদে বাকি এলাকার মানুষের চলাচলের একমাত্র অবলম্বন রিকশা, ব্যাটারি রিকশা ও ইজিবাইক। স্বল্প দূরত্বে স্কুল-কলেজে যাওয়া, বয়স্ক ও রোগী বহণ, বাজার সওদার জন্য এটা সহজ মাধ্যম। ব্যাটারিচালিত রিকশা ও ইজিবাইক সাশ্রয়ী, সহজলভ্য ও পরিবেশ বান্ধব এবং চালকের প্যাডেল চালনার কষ্ট লাঘব হওয়ায় এই পরিবহনের চাহিদা ব্যাপক বেড়েছে। প্রযুক্তি ও বাস্তবতাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। পরিবেশ রক্ষায় কার্বন নিঃসরণ কমাতে হলে ইলেকট্রিক বা ব্যাটারিচালিত যানবাহনের বিকল্প নেই। ঢাকা মহানগরে যানজটের প্রধান কারণ প্রাইভেট গাড়ি যারা রাস্তার ৭৬ ভাগ দখল করে রাখে; অথচ মাত্র ৬ ভাগ যাত্রী বহন করে। একইভাবে সড়কে দুর্ঘটনায় ব্যাটারি চালিত যানবাহনের দায় ৫ ভাগ থাকলেও ব্যাটারি রিকশা ও ইজিবাইককে অভিযুক্ত করা হচ্ছে। অথচ প্রকৃত সত্য হচ্ছে সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনার শিকার মোটরসাইকেল। তাই বলে কি মোটরসাইকেল চলাচল নিষিদ্ধের প্রস্তাব আসবে?

নেতৃবৃন্দ বলেন, ঢাকা মহানগরে বর্তমানে প্রায় ১০ লাখ ব্যাটারিচালিত রিকশা ও ইজিবাইক চলাচল করে। এই পরিবহন বন্ধ করলে প্রায় ১৫ লাখ মানুষ এক ধাক্কায় বেকার হয়ে পড়বে। লাগামহীন দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি বাজারে চালক ও তাদের উপর নির্ভরশীল লাখ লাখ মানুষের জীবন-জীবিকা হুমকির মুখে পড়বে। তাছাড়া এখানে কাজ হারিয়ে যে বিশাল বেকার তৈরি হবে তার দায় কি সরকার বহন করতে পারবে?

ইতিপূর্বে মহাসড়ক ছাড়া সর্বত্র চলাচলে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের দুটি আদেশ ও আন্দোলনের মুখে গত সরকারের মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঢাকা মহানগরের প্রধান সড়ক ও দেশের ২২ মহাসড়ক ছাড়া সর্বত্র চলাচলের ঘোষণা প্রদান করে। সুপ্রিম কোর্টের রায় থাকায় হাইকোর্টের এই রায় কার্যকর কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্য আইন বিশেষজ্ঞসহ সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। প্রয়োজনে এই রায়ের বিরুদ্ধে পুনরায় আইনি লড়াই করার ও নীতিমালা চূড়ান্ত করার আন্দোলনের ঘোষণা করেন সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় রিকশা চালক ও গ্যারেজে হামলা, মামলা ও নির্যাতন বন্ধ করার এবং হামলা-নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলারও আহ্বান জানান। একইসাথে গ্রেপ্তারকৃত রিকশা শ্রমিকদের মুক্তি ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করার আহ্বান জানান।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ ১৫ লাখ চালকের জীবন-জীবিকা ও তাদের উপর নির্ভরশীল লাখ লাখ মানুষের জীবন-জীবিকা রক্ষার আহ্বান জানান। একইসাথে মহানগরের প্রধান সড়কে ব্যাটারি রিকশা চলাচল না করার ব্যাপারে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া ও রাস্তায় চলার নিয়ম, ট্রাফিক আইন নিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা জরুরিভাবে করা দরকার বলে মনে করেন সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দ।

নেতৃবৃন্দ নীতিমালা চূড়ান্ত করে ও আধুনিকায়ন করে ব্যাটারিচালিত যানবাহনের নিবন্ধন, চালকদের লাইসেন্স ও রুট পারমিট প্রদান, প্রতিটি সড়ক মহাসড়কে ইজিবাইক, রিকশাসহ স্বল্পগতির ও লোকাল যানবাহনের জন্য পৃথক সার্ভিস রোড নির্মাণ করে সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনারও জোর আহ্বান জানান।

বিক্ষোভ মিছিল জাতীয় প্রেসক্লাব, তোপখানা রোড হয়ে সংগ্রাম পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এসে শেষ হয়।

'প্রেক্ষিত : জুলাই অভ্যুত্থান-বৈষম্যহীন সমাজ কোন পথে?' শীর্ষক আলোচনাসভা

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ১০৭তম বার্ষিকীতে 'প্রেক্ষিত : জুলাই অভ্যুত্থান-বৈষম্যহীন সমাজ কোন পথে?' শিরোনামে ১৪ নভেম্বর '২৪ ডাকসু ভবনের দ্বিতীয় তলায় কনফারেন্স রুমে সেমিনারের আয়োজন করেছে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মুক্তা বাড়ৈ এর সভাপতিত্বে সেমিনারে আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক হারুন রশীদ, বাসদের সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন ও ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সুহাইল আহম্মেদ শুভ। সেমিনার পরিচালনা করেন ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দিন।

সেমিনারে আলোচকবৃন্দ বলেন, সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি যেদিন থেকে গড়ে উঠেছে সেদিন থেকেই মানুষের বৈষম্য শুরু হয়েছে। আমাদের দেশে অনেকগুলো আন্দোলন হয়েছে, হয়েছে শাসকের পরিবর্তন কিন্তু মানুষের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। '২৪ গণ অভ্যুত্থানে জাতির প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রাপ্তিও নগণ্য। বৈষম্যের বিরুদ্ধে এক মহাজাগরণ বাংলাদেশের জনগণ প্রত্যক্ষ করল। মানুষ চেয়েছিল একটা বৈষম্যমুক্ত সমাজ। আদৌ সে পথে হাঁটছে কি বাংলাদেশ?

স্বৈরাচারী শাসক উৎখাত হয়েছে কিন্তু ব্যবস্থা রয়ে গেছে, তার বদল হয়নি। স্বৈরাচারী ভাষারও পরিবর্তন ঘটেনি। দখলের স্থলে পাল্টা দখল এসেছে। স্বৈরাচারী শাসনের এর একটা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি আছে—এর সাথে ব্যবস্থাকে অভিন্ন করা যায় না। পুঁজিবাদী অর্থনীতিই বৈষম্য তৈরির কারখানা। এখানে মালিক আছে, শ্রমিকও আছে। উভয়ের স্বার্থ ভিন্ন। মালিক যত বেশি মুনাফা করবে শ্রমিক তত শোষিত হবে। এই ব্যবস্থায় অর্থনীতির ক্ষেত্রে নৈরাজ্য থাকে। এই ব্যবস্থা বেকার সমস্যার সমাধান করে না এবং করতে চায়ও না। সে চায় না বেকারের সংরক্ষিত বাহিনী লুপ্ত হয়ে যাক, সস্তা শ্রমের সবরাহ বন্ধ হয়ে যাক। পুঁজিবাদ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বৈষম্যের বীজ রোপণ করে রেখেছে। এই ব্যবস্থায় অর্থনীতি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকে না, বিপরীতভাবে বলতে গেলে পুঁজিবাদী অর্থনীতিই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক। তাই ব্যবস্থাটা গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ বিগত দিনের শাসনের মতো অগণতান্ত্রিক শাসন চায় না, মিথ্যা বিবরণ শুনতে চায় না, ভয়ের পরিবেশ থেকে মুক্তি চায়।

আজকে আমরা যখন বলি মেধা চাই, বৈষম্যময় সমাজে তো মেধার মূল্যায়ন হয় না। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বৈষম্যহীন সমাজের কথা বললে সমতার কথা বললে সেটা হবে বড় বৈষম্য। সমাজে শ্রেণিতে শ্রেণিতে, মানুষে মানুষে, ধনী-গরিবে, শিক্ষা-চিকিৎসাসহ সর্বক্ষেত্রে পুঁজিবাদ বৈষম্য বজায় রেখেছে। কোটাটা ছিলো একটা সময় বৈষম্য দূর করার অস্ত্র আর শাসকরা এটাই বৈষম্য তৈরির অস্ত্রতে পরিণত করেছে।

'২৪ এর জুলাই আন্দোলনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের থেকেও আওয়াজ উঠেছে আমরাও তো রাষ্ট্র পরিচালনায় ট্যাক্স দিই কিন্তু আমাদের কেনো এতো টাকা দিয়ে শিক্ষা নিতে হবে? শিক্ষা কেন কেনাবেচার পণ্য হবে। নাগরিকরা কেন অধিকার ভোগ করতে পারবে না।

পুঁজিবাদী এই রাষ্ট্রের সংস্কারের কথা জোরেশোরে উঠেছে। কারণ এই ব্যবস্থা বহাল থাকলে সকল প্রকার বৈষম্য থাকবে। এর জন্য অনেকগুলো কমিশনও হয়েছে। এই সরকারের কাজ হবে সংস্কারের ভিত্তি তৈরি করা। মানুষের মধ্যে অধিকারের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দেওয়া, আর সংস্কারের কাজটা সম্পন্ন করতে হবে নির্বাচিত সরকারকে। মানুষ আশা করে সংস্কারের মাধ্যমে বর্তমান ব্যবস্থার উন্নতি হবে। বৈষম্য দূর করতে হলে একটা বিপ্লব লাগবে, একটা নতুন ব্যবস্থার পত্তন করতে হবে।

৭ নভেম্বর '২৪ মহান সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ১০৭তম বার্ষিকী পালিত হয়েছে। যে বিপ্লবের মাধ্যমে রাশিয়ার জনগণ সত্যিকার অর্থেই পেরেছিল এক বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে। যা সারা দুনিয়ার চোখে আজও এক বিস্ময়। বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মডেল হতে পারে সোভিয়েত সমাজতন্ত্র। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই ও একটি বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এখনো অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক।

বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইটা থাকবে, লড়বে আজকের যুবসমাজ। এই স্বপ্নটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। অভ্যুত্থানের চেতনা বিপ্লবের পথ দেখাবে। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াই ব্যতীত মানুষের মুক্তি সম্ভব না, সে লড়াইয়ে শামিল হওয়ার জন্য তরুণ ছাত্রসমাজকে আহ্বান জানান আলোচকবৃন্দ।

সংস্কার প্রস্তাব : নির্বাচন ব্যবস্থা

নির্বাচন সংস্কার কমিশনে বাসদের প্রস্তাব

জুলাই-আগস্টের অভূতপূর্ব ছাত্র-শ্রমিক, জনতার গণ অভ্যুত্থানে দেড় সহস্রাধিক শহিদের আত্মবলিদানের এবং প্রায় ৩০ হাজার মানুষের পঙ্গুত্ব বরণ, অন্ধ হওয়া তথা আহত হওয়ার মাধ্যমে বিগত ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগ ও দেশত্যাগের পর অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও অভ্যুত্থানের দাবি অনুযায়ী সরকার বিভিন্ন বিষয়ে সংস্কারের জন্য প্রথমে ৬টি, পরে আরও ৫টি মোট ১১টি কমিশন গঠন করেছেন। তারমধ্যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সচল রাখার জন্য রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থায় জনগণের মতামতের প্রতিফলন ঘটানোর লক্ষ্যে জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য গঠিত নির্বাচন সংস্কার কমিশন অন্যতম। এই বিষয়ে অর্থাৎ নির্বাচন সংস্কারের জন্য রাজনৈতিক দলসমূহের কাছ থেকে সংস্কার প্রস্তাবের বিষয়ে মতামত/ সুপারিশ লিখিতভাবে গ্রহণের জন্য আপনারা উদ্যোগ নিয়েছেন এবং আমাদের দলের কাছেও প্রস্তাব চেয়ে পত্র দিয়েছেন। যদিও লিখিত প্রস্তাবের পাশাপাশি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বশরীরে উপস্থিতিতে কমিশনের সাথে আলোচনা করতে পারলে প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তিসমূহ সবিস্তারে তুলে ধরা যেত। তারপরেও জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের দলের প্রস্তাব চাওয়ার জন্য আপনিসহ কমিশনের সকল সদস্য এবং কমিশনের কাজে সহায়তাকারী সকল স্টাফদেরকে আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রথমেই বলে নিতে চাই যে, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের মতো দেশ ও জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংযোজন-বিয়োজন, পরিমার্জন-পরিবর্ধন এক কথায় সংশোধন করা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি অর্থাৎ জাতীয় সংসদ ছাড়া কতটুকু সম্ভব তা বোধগম্য নয়। অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে একাজ করা কতটুকু সম্ভব এবং এটা তাদের দায়িত্বের মধ্যেও পড়ে কী না সেটা বিবেচনায় নেওয়া দরকার বলে আমরা মনে করি। কিন্তু জনমত সৃষ্টি করে নির্বাচিত সরকারের উপর চাপ প্রয়োগের হাতিয়ার হিসাবে সুপারিশ আকারে প্রস্তাবনা আসতে পারে। তবে তা জনমনে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে, নির্বাচিত সরকার কার্যকর না করলে জনগণের কিছু করার থাকে না। অতীতে এর বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭২ সালের সংবিধানে বেশ কিছু অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও অনেক ভালো কথা লিপিবদ্ধ ছিল, '৯০-এর গণ অভ্যুত্থানের পরে ১৯৯১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে অর্থ-বাণিজ্য, শিল্প-কৃষি, শিক্ষা-সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের ২২৫ জন দেশ বরেণ্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত ২৯টি টাস্কফোর্স এর মাধ্যমে সংস্কারের বেশ কিছু সুপারিশ করা হয়েছিল, ২০০৭ সালের এক এগারোর সরকার আমলেও বেশ কিছু সংস্কারের সুপারিশ করা হয়েছিল। তার কোনটাই বাস্তবায়ন হয় নাই।

সম্মানিত কমিশন, আপনাদের পক্ষ থেকে নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার সম্পর্কে আমাদের দলের কাছে যে প্রস্তাব চাওয়া হয়েছে তার বাইরেও আমরা অতিরিক্ত কিছু বিষয় যা হয়তো মনে হবে আপনাদের এখতিয়ার বহির্ভূত কিন্তু নির্বাচনের সাথে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত বিবেচনায় প্রস্তাব করছি। আশা করি আপনারা রাজনৈতিক ও নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় জুড়ে থাকা অন্ধকারকে শিরোধার্য না করে ফুটে ওঠা গণতান্ত্রিক আদর্শের আলোকে আমাদের প্রস্তাবসমূহ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন। অবাধ, সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন ও নিয়মতান্ত্রিক ক্ষমতা হস্তান্তরের স্বার্থে এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে কলুষমুক্ত রাখা ও জনমতের প্রতিফলন ঘটানোর লক্ষ্যে আমাদের উত্থাপিত বিষয়গুলো বিবেচনায় নেবেন আশা করি।

আমরা প্রত্যেকটি বিষয় ধরে ধরে খুঁটিনাটি পর্যালোচনা ও আমাদের মতামত হয়তো এ মুহূর্তে রাখতে পারবো না, শুধু জরুরি কতিপয় বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করবো। আমরা আশা করবো ভবিষ্যতে সশরীরে মতবিনিময়ের ব্যবস্থা করলে আমরা সবিস্তারে নানা বিষয় তুলে ধরতে পারবো যা হয়তো নির্বাচন ব্যবস্থা ও নির্বাচন কমিশনের সার্বিক কার্যক্রমকে জনগণের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষানুযায়ী আরও অধিক কার্যকারিতা সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারে।

আপনারা আমাদের সঙ্গে একমত হবেন যে অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের নিশ্চয়তা, তার স্বচ্ছতা, গ্রহণযোগ্যতা, শুধু নির্বাচন কমিশনের একক কর্মপ্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে না। যদিও নির্বাচনের সফলতা ব্যর্থতার দায়-দায়িত্বের সিংহভাগ নির্বাচন কমিশনকেই বহন করতে হয়। যে কারণে নির্বাচনের জন্য কমিশনকে মুখ্য ভূমিকায় রেখে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল রাজনৈতিক দলসমূহ, বিচার ব্যবস্থা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী, সিভিল প্রশাসন, দুর্নীতিদমন কমিশনসহ রাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ একযোগে সমন্বিত উদ্যোগে ক্রিয়াশীল হলেই কেবলমাত্র সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করা সম্ভব। কিন্তু সার্বিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, আইনের শাসন, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির অভাব ও প্রতিষ্ঠানসমূহের দলীয়করণকৃত কিংবা ভঙ্গুর দশা এবং ক্ষমতার মালিক যে জনগণ তাদের আস্থা, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ব্যাপক গণউদ্যোগের ঘাটতিতে সব আয়োজন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তাতে শাসন ক্ষমতার অনুমোদন হয়তো প্রদর্শিত হয় কিন্তু জনগণের প্রকৃত ক্ষমতায়ন হয় না। ফলে নির্বাচন তখন শাসক শ্রেণি ও দলের স্বেচ্ছাচারের পথ উন্মুক্ত ও প্রসারিত করে। গণতান্ত্রিক শাসনের জন্য নির্বাচন অপরিহার্য কিন্তু নির্বাচন হলেই গণতন্ত্র হয় না তার দৃষ্টান্ত জার্মানি, ইটালিসহ ইতিহাসে ভুরি ভুরি রয়েছে। আমাদের দেশের ইতিহাসও তার ব্যতিক্রম নয়।

সংস্কারের প্রস্তাবসমূহ :

১। (ক) 'নির্বাচন কমিশন: সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮ : নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা' প্রসঙ্গে 'কোন আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনকে নিয়োগ দান করিবেন' বলে যা নির্দেশিত হয়েছে, সেই আইনটি স্বাধীনতা পরবর্তী কাল থেকে ২০২২ পর্যন্ত করা হয়নি। ২০২২ সালে আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী সকল দল ও অপরাপর অংশীজনসহ ব্যাপক পরিসরে আলোচনা পর্যালোচনা না করে এবং মতামত না নিয়ে একটি ত্রুটিপূর্ণ আইন প্রণয়ন করেছে। ফলে আইনটিও তার বিধানাবলী সকলের মতামত নিয়ে সংশোধন করা প্রয়োজন।

(খ) আমরা লিঙ্গ বৈষম্য যথাসম্ভব দূর করে নির্বাচন কমিশনকে উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও কেন্দ্র এই চার স্তরে স্থায়ী জনবলসহ স্বতন্ত্র কাঠামোয় দাঁড় করানোর প্রস্তাব করছি। বর্তমানের ৮ বিভাগের তদারকির দায়িত্ব দিয়ে ৮ জন সদস্যসহ মোট ৯ সদস্যের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন কাঠামো গঠন করা, যার একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার থাকবেন। অনুরূপ বিভাগে ৫ সদস্য, জেলা, উপজেলায় ৩ সদস্যের কমিশন কাঠামো হতে পারে।

(গ) নির্বাচন কমিশন গঠন : লিঙ্গ বৈষম্য যথাসম্ভব দূর করে 'সার্চ কমিটি' বা 'সিলেক্ট কমিটি' গঠন করা যেতে পারে। নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতি দলের ১ জন মনোনীত প্রতিনিধি, নিবন্ধিত দলসূহের বাইরে ক্রিয়াশীল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণকারী সেক্যুলার গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল দলের ১ জন করে প্রতিনিধি, বিচার বিভাগ কর্তৃক মনোনীত এপিলেড ডিভিশনের ১ জন বিচারপতির সমন্বয়ে সার্চ বা সিলেক্ট কমিটি গঠন করা যেতে পারে। কমিটি কোন রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে কোন নাম প্রস্তাব চাইবে না। এ কমিটি কর্তৃক মোট উত্থাপিত নামের মধ্য থেকে সর্বসম্মতিতে বা ভোটে দশ জনের প্যানেল তৈরি করবেন। রাষ্ট্রপতি সেখান থেকে ৯ জন কেন্দ্রীয় কমিশনের কমিশনার নিয়োগ দেবেন। কমিশনারগণ নিজেদের মধ্য থেকে ঐকমত্যে অথ বা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ ভোটে একজনকে নির্বাচিত করবেন, তাঁকে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসাবে নিয়োগ দান করবেন। অন্যান্য কাঠামোর প্রধানসহ কমিশনারগণ কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে বিধানাবলী সাপেক্ষে (যা প্রণয়ন করতে হবে) নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।

(ঘ) জাতীয় বাজেটে নির্বাচন কমিশনের জন্য পৃথক সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ থাকতে হবে (স্থায়ী কাঠামোগত ব্যয় ও নির্বাচনী খরচ)। যাতে অর্থমন্ত্রণালয়ের কর্তৃত্বমুক্ত অর্থ ছাড় করার ব্যবস্থা থাকবে।

(ঙ) নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপমুক্ত নির্বাচন কমিশন সচিবালয় পরিচালিত হবে ও জনবল সংগৃহীত হবে। নির্বাচনকে টাকা, পেশী শক্তি, আঞ্চলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, নির্বাচনমুখী দান-অনুদান, রাজনৈতিক দলীয় এবং কায়েমী স্বার্থবাদী শক্তিসহ যে কোন প্রতিবন্ধকতা মুক্ত রাখতে সারা বছরের অনুসন্ধান, গবেষণা ও দুদকসহ বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তায় প্রতিকারমূলক কার্যক্রম কমিশন সচিবালয়কে সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে নিতে হবে।

২। নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ মানদণ্ড :

(ক) নির্বাচন কমিশনের সদস্যগণকে অবশ্যই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সংবিধান প্রনীত রাষ্ট্রীয় ৪ মূলনীতিতে বিশ্বাসী হতে হবে। অতীত কিংবা বর্তমানে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, যুদ্ধাপরাধ কিংবা অনুরূপ দলের সাথে সম্পৃক্ত থাকেননি। তাদের নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের নামে স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পদের হিসাব জনসম্মুখে প্রকাশের জন্য জমা দিতে হবে।

(খ) এই সদস্যগণ কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য থাকলে, দলের পক্ষে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলে, ফৌজদারী অপরাধে দণ্ডিত হলে, বিদেশি নাগরিক হলে, দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হলে, ঋণ খেলাপি হলে, কালো টাকা সাদা করে থাকলে, অনুপার্জিত সম্পদের মালিক হলে, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে থাকলে, মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী হলে যোগ্যতা হারাবেন।

৩। নির্বাচন কমিশনকে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১১৯ বিধান মতে শুধু

(ক) রাষ্ট্রপতি পদের ও সংসদ সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের স্বাধীন দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আমরা মনে করি স্থানীয় সরকারসহ সকল নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ ও আয়োজন করার পূর্ণ এখতিয়ার নির্বাচন কমিশনের থাকতে হবে। নির্বাহী কতৃত্ব তা অনুসরণ করবেন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন। নির্বাচনকালীন সময়ে সরকার শুধুমাত্র রুটিন কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ থ াকবেন।

(খ) অনুচ্ছেদ-৫৯ এ Local Government এর বাংলা অনুবাদ স্থানীয় শাসন যথাযথভাবে পরিবর্তন করে স্থানীয় সরকার করতে হবে। এবং আর্থিকসহ স্ব-শাসিত কার্যকর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে।

(গ) আমরা সংবিধানের ৩য় পরিচ্ছেদ-এ স্থানীয় শাসন নির্দেশনার অনুচ্ছেদ-৫৯ এর আলোকে গ্রাম (ওয়ার্ড), ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও কেন্দ্র এই ৬ স্তরে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসনভার নিশ্চিত করার প্রস্তাব করছি। সিটি কর্পোরেশন (মেট্রোপলিটন), পৌরসভা ইত্যাদিতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিত্ব ঐ ছয় স্তরের কাঠামোগত বিন্যাসের সাথে সামঞ্জস্য ও সংগতি রেখে করা। কারণ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত তথা গণপ্রতিনিধিত্বশীল সংস্থা স্তরায়িত না হলে শুধু মাত্র কেন্দ্রে বা মাঝের কোন স্তরে নির্বাচন বাস্তবে গণপ্রতিনিধিত্বের কাঠামোগত পূর্ণ অবয়ব ধারন করতে পারেনা এবং আমলাতান্ত্রিক প্রভাবমুক্ত কার্যকারিতা সম্পন্ন হয়ে উঠতে পারেনা।

(ঘ) স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত সদস্যদের স্থানীয় সরকার মন্ত্রক কর্তৃক বরখাস্ত করার বিধান রদ করতে হবে। ফৌজদারি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত হলে পদ চলে যাবে। জাতীয় সংসদসহ স্থানীয় সরকারের সকল ক্ষেত্রে যে জনগণ ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছে সেই জনগণের হাতে 'কলব্যাক' অর্থাৎ প্রতিনিধিত্ব প্রত্যাহার করার বিধান করতে হবে। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রার্থীতা নির্দলীয়ভাবে হতে হবে।

(ঙ) সাংবিধানিক অধিকার হরণ, লঙ্ঘন, বঞ্চনা নিষ্পত্তির পাশাপাশি নির্বাচন সংক্রান্ত অভিযোগ মামলা নিষ্পত্তির জন্য সাংবিধানিক আদালত গঠন করা যেতে পারে। নির্বাচনী বিরোধ মামলা ৩ মাসের মধ্যে চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তিমূলক রায় ঘোষণা করতে হবে এবং ১ মাসের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করে চূড়ান্ত রায় দিতে হবে।

(চ) নির্বাচনী জামানত ও ব্যয় : নির্বাচনে প্রার্থীর জামানত ৫০০০ টাকার উর্ধে নয় এবং নির্বাচনী ব্যয় তিন লক্ষ টাকার উর্ধে করা সঙ্গত হবে না।

(ছ) 'না' ভোট : যে কোন স্তরের নির্বাচনে প্রার্থী বা দলের কাউকে সমর্থনযোগ্য মনে না হলে সেক্ষেত্রে ভোটারের 'না' ভোট প্রদানের বিধান রাখতে হবে।

৪। (ক) সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন : আমরা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলসমূহের প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে সংসদ সদস্য সংখ্যা নির্বাচনের প্রস্তাব করছি। একবারে ৩০০ আসনে না হলেও প্রথমে অর্ধেক আসন ও ধাপে ধাপে পর্যায়ক্রমে পুরো নির্বাচন সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে করা। অনির্বাচিত সংরক্ষিত নারী আসনের বদলে ৩টি সাধারণ আসন মিলে একটি সংরক্ষিত নারী আসনে অর্থাৎ ১০০টি নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের প্রস্তাব করছি। পার্বত্য তিন জেলায় সাধারণ ও নারী আসনে কেবলমাত্র পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্য থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিশেষ বিধানের প্রস্তাব করছি। সংসদ সদস্যগণ শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় ও সরকারি নীতি নির্ধারণ, বাস্তবায়ন, তদারকি ও আইন প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করবেন।

(খ) সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদেরও সংশোধন দরকার, কারণ এতে সাংসদদের ব্যক্তি স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে। আমাদের মতে ৩টি বিষয় অর্থাৎ (১) আলোচনা-মতামতের পর বাজেট (অর্থবিল) পাশ করার সময় (২) জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত যথা বহিঃশত্রুর আক্রমণ তথা যুদ্ধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে (৩) সরকারের প্রতি অনাস্থা ভোটের সময় দলীয় হুইপ যাতে কার্যকর থাকে এটা রেখে ৭০ অনুচ্ছেদের সংশোধন করা প্রয়োজন মনে করি।

(গ) রাষ্ট্রপতি ও নির্বাহী প্রধান তথা প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা দূর করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার প্রস্তাব করেছি। স্থানীয় সরকারের কোন ক্ষেত্রে উপদেষ্টা হিসাবে উপদেশ দেওয়া এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হওয়া থেকে বিরত রাখতে হবে।

(ঘ) ১৮৬১ সালের উপনিবেশিক পুলিশ অ্যাক্ট এর বদলে স্বাধীন দেশের গণতান্ত্রিক শাসনের উপযোগি পুলিশ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সকল

এরপর পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ১

মন্ত্রী-সচিব, পরামর্শক, উপদেষ্টাসহ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে দুর্নীতি ও লুণ্ঠনে জড়িতদের বিচার দাবি

তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি

ভারতের আদানির বিদ্যুৎকেন্দ্রের চুক্তি পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে

'বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত : বর্তমান পরিস্থিতি ও করণীয়' শিরোনামে এক গোলটেবিল ২৬ অক্টোবর '২৪ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি হলে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি ঢাকা নগরের উদ্যোগে নগর সমন্বয়ক জুলফিকার আলীর সভাপতিত্বে ও যুগ্ম সমন্বয়ক খান আসাদুজ্জামান মাসুমের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বক্তব্য রাখেন জাতীয় কমিটির সাবেক সদস্যসচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এম এম আকাশ, অস্ট্রেলিয়ার ওয়েস্টার্ন সিডনি ইউনিভার্সিটির ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিস চৌধুরী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মোশাহিদা সুলতানা।

নেতৃবৃন্দ বলেন, যে কোনো দেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান বিষয় সে দেশের জ্বালানি সক্ষমতা এবং নিরাপত্তা কতখানি আছে। কৃষি-শিল্প, সেবা খাতের এমন কোন বিষয় নেই যা জ্বালানির উপর নির্ভরশীল নয়। জ্বালানি সক্ষমতা অর্জন এবং জ্বালানি নির্ভরতা বর্জনের প্রশ্নটি একটি দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সাথে সম্পর্কিত। ফলে প্রতিটি দেশের নিজস্ব জ্বালানি নীতি ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা থাকতে হয়। বাংলাদেশের মতো দেশ যার তীব্র বেকারত্ব আর সস্তা শ্রমশক্তি নিয়ে আমদানি, উৎপাদন ও রপ্তানি করে বিশ্ববাজারে টিকে থাকতে হয় তার জন্য সঠিক জ্বালানি নীতি ও পরিকল্পনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যুৎ উৎপাদন না আমদানি, জীবাশ্ম জ্বালানি না নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার এসব নিয়ে যেমন বিতর্ক আছে তেমনি কী হতে পারে দেশের জন্য সঠিক নীতি তা নিয়েও বিতর্ক হওয়া দরকার। আওয়ামী লীগ সরকার লুণ্ঠন সহায়ক জ্বালানি নীতি, দায়মুক্তি দিয়ে উৎপাদন পরিকল্পনা, ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি, সুন্দরবন, বঙ্গোপসাগরসহ দেশের পরিবেশ ধ্বংসী কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন, কুইক রেন্টালের নামে বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীদের কুইক প্রফিটের ব্যবস্থা করা, ক্যাপাসিটি চার্জের নামে রাষ্ট্রের টাকা পছন্দের ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিয়ে জ্বালানি খাতকে একটি লুটপাটের ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। লুটপাটের পরিণতিতে শুধু গৃহস্থালি খাতে, উৎপাদন খাতে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে তাই নয় জনগণের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পাচার হয়েছে। যার দুঃসহ ভার বহন করতে হবে অনেকদিন। এর বিকল্প কী ছিল না? জনগণের স্বার্থের দিক বিবেচনা করে জ্বালানি নীতি ও পরিকল্পনা কী হতে পারে সেই প্রস্তাবনা তেল-গ্যাস, বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই প্রস্তাব উপেক্ষিত হয়েছে।

ছাত্র-শ্রমিক জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের ক্ষমতা পরিত্যাগের পর বর্তমান পরিস্থিতিতে আবার আমরা জ্বালানি বিষয়টিকে আলোচনার বিষয় হিসেবে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে চাই। এক্ষেত্রে কয়লা-তেল, গ্যাস জীবাশ্ম জ্বালানি আর বায়ু, পানি, সৌর শক্তি নবায়ন যোগ্য জ্বালানি, পাশাপাশি পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন নিয়ে কী হতে পারে আগামী দিনের করণীয় সে বিষয়েগুলো নানা দিক থেকে আলোচনা হওয়ার দরকার।

বৈঠকে নেতৃবৃন্দ বলেন, দায়মুক্তি আইন তৈরির সময়ই বোঝা গেছে, ভয়ংকর কিছু ঘটবে। ২০১৫ সালে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রকেও দায়মুক্তি দেওয়া হয়েছে। একই কোম্পানি ভারতে ৫০০ কোটি ডলার ও বাংলাদেশে ১ হাজার ২০০ কোটি ডলার খরচ করে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি করছে। এখানে অনেক গোপন খরচ আছে। গত সরকারের সময় তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস

এরপর পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ১

চট্টগ্রামে আদালত চত্বরে আইনজীবী হত্যার বিচারের দাবি

সারাদেশে সংঘাত-সংঘর্ষ বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, শিক্ষার গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং চট্টগ্রামে আদালত চত্বরে আইনজীবী হত্যার বিচারের দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন এর উদ্যোগে ২৭ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি মাহির শাহরিয়ার রেজা সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মুক্তা বাড়ৈ, সাংগঠনিক সম্পাদক সুহাইল আহমেদ শুভ, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক বাহাউদ্দিন শুভ, সদস্য সালমান রাহাত। পরিচালনা করেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দিন।

গণ অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশ : ছাত্র সমাজ কী পাবে কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা ?

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

অর্জিত হয় সাময়িক বিজয়। তা সত্ত্বেও শাসকশ্রেণির নানা আক্রমণ বহাল থাকে; বিপরীতে চলমান থাকে ছাত্র-শ্রমিক, কৃষক-জনতার ঐক্যবদ্ধ লড়াই। ছাত্র সমাজের আকাঙ্ক্ষা ছিল—একটি সর্বজনীন-বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা। শ্রমিক-কৃষকদের আকাঙ্ক্ষা ছিল শোষণ-নিপীড়ন থেকে মুক্তি। মানুষের স্বপ্ন ছিল ভাত-ভোট, চিকিৎসা ও কাজের অধিকার। এই সমস্ত লড়াইয়ের ঐকতান সংঘটিত করে গণ অভ্যুত্থান ও তার ধারাবাহিকতায় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় আমাদের স্বাধীনতা।

স্বাধীন দেশে গত ৫৩ বছরে শাসকশ্রেণি গণ-আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে দেশকে পরিচালনা করেছে। লোক দেখানো গণতন্ত্রের আড়ালে সামরিক-বেসামরিক স্বৈরতন্ত্র, ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকার পর্যন্ত ভূলুণ্ঠিত করা, মানুষকে মৌলিক-মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, শিক্ষা-স্বাস্থ্যসহ পরিষেবা খাতগুলির বেসরকারিকরণ করে ক্রমান্বয়ে ব্যক্তি পুঁজির হাতে ছেড়ে দেয়া, শোষণ-লুণ্ঠন ও দখলের মধ্য দিয়ে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলার প্রক্রিয়ার কষাঘাতে জর্জরিত জনজীবন। সর্বশেষ স্বৈরাচারী হাসিনার শাসন এসবের সাক্ষ্য বহন করে। এই দীর্ঘ সময়ে শাসকশ্রেণির অন্যায় রাজনীতির পক্ষে অবস্থান নিয়ে দমন-পীড়নে যুক্ত হওয়া ছাত্রদের যেমন একটা অংশ রয়েছে তেমনি তার বিপরীতে এই অন্যায় রাজনীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার থেকে অব্যাহত লড়াই-সংগ্রাম পরিচালনা করেছে ছাত্রদের আরেকটি অংশ। সম্প্রতি এক রক্তক্ষয়ী গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে স্বৈরাচারী হাসিনা সরকার বিদায় হয়েছে। কিন্তু অবস্থার কতটা উন্নতি হবে তা নির্ভর করে রাষ্ট্র পরিচালনার গতিমুখের উপর।

রফিউর রাব্বী বলেন, শিক্ষা-স্বাস্থ্যসহ মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার বদলে এগুলোকে বাজারি পণ্যে পরিণত করেছে। শিক্ষাখাতে রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ কমেছে। শিক্ষা লাগামহীনভাবে হয়ে পড়েছে ব্যয়বহুল। ক্রমাগত বাড়ছে বেতন-ফি, নামে বেনামে নানান খাতে আদায় করা হচ্ছে অতিরিক্ত অর্থ। বর্তমান সময়ে কাগজসহ শিক্ষা উপকরণের দাম আকাশচুম্বি। বই-খাতা, কলমসহ শিক্ষা উপকরণের অসহনীয় মূল্যবৃদ্ধিতে হিমশিম খাচ্ছে ছাত্রসমাজ তথা দেশের মানুষ। দেশে মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা বিরোধী সাম্প্রদায়িক শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। শিক্ষার বিষয়বস্তুতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কূপমণ্ডুক, অবৈজ্ঞানিক, সাম্প্রদায়িক বিষয়বস্তু।

নেতৃবৃন্দ বলেন, অতীতেও অনেক গণ-আন্দোলন অভ্যুত্থান হয়েছে কিছু ব্যবস্থা বহাল থাকলে এর সুফল মানুষ পায় না। তাই ব্যবস্থা পরিবর্তন জরুরি।

'দ্রোহে-প্রতিরোধে লালন' শীর্ষক আলোচনা ও লালনের গান

চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র মিরপুর থানা শাখার উদ্যোগে ২২ নভেম্বর লালন ফকিরের ১৩৫তম প্রয়াণ দিবস স্মরণে ঋদ্ধি গ্যালারিতে 'দ্রোহে-প্রতিরোধে লালন' শীর্ষক আলোচনাসভা ও লালনের গান পরিবেশন করা হয়। চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সংগঠক ইলিয়াস হাসান ইলুর সভাপতিত্বে আলোচনা করেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, চারণের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি শাহজাহান কবীর, আব্দুল্লাহ আল মামুন তাজু, সভা পরিচালনা করেন নাসির উদ্দীন প্রিন্স।

সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, আমাদের দেশসহ বিশ্বের দেশে দেশে এখন ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক উন্মাচনা চলছে। লালনের সময় যেমন সমাজে ধর্ম-বর্ণ, গোত্র ও জাতপাতের মধ্যে বিরোধ ছিল তিনি সংগীতের মাধ্যমে তার স্বরূপ তুলে ধরেছেন। প্রশ্ন তুলেছে, একই সাথে সেগুলোর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন মানবতার ধর্মকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন, বিদ্রোহ করেছেন। মানবতার জয়গান গেয়েছেন। তার মৃত্যুর ১৩৫ বছর পর আজও সে বিষয়গুলো সমান মাত্রায় সমাজে বিদ্যমান আছে। তাই সমাজ থেকে এই ব্যাধি নির্মূলে লালন এখনও প্রাসঙ্গিক।

আজকে সমাজে যত বেশি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিরাজ করবে সাম্প্রদায়িকতা, উগ্র মৌলবাদী শক্তি তত পিছু হটবে। তাই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বৈষম্যবিরোধী লড়াই জোরদার করতে হবে, অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চেতনায় গণ-ঐক্য গড়ে তুলতে হবে।

সংস্কার প্রস্তাব : সংবিধান

সংবিধান সংস্কার কমিশনে বাসদের প্রস্তাব

জুলাই-আগস্টের অভূতপূর্ব ছাত্র-শ্রমিক, জনতার গণ অভ্যুত্থানে দেড় সহস্রাধিক শহিদের জীবন বলিদানের মাধ্যমে বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের পদত্যাগ ও দেশত্যাগের পর অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও অভ্যুত্থানের দাবি অনুযায়ী সরকার বিভিন্ন বিষয়ে সংস্কারের জন্য প্রথমে ৬টি, পরে আরও ৫টি মোট ১১টি কমিশন গঠন করেছেন। তারমধ্যে অন্যতম হলো রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বোচ্চ আইন সংবিধান সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশন। এই বিষয়ে অর্থাৎ সংবিধান সংস্কারের জন্য রাজনৈতিক দলসমূহের কাছ থেকে সংস্কার প্রস্তাবের বিষয়ে মতামত/ সুপারিশ লিখিতভাবে গ্রহণের জন্য আপনারা উদ্যোগ নিয়েছেন এবং আমাদের দলের কাছেও প্রস্তাব চেয়ে পত্র দিয়েছেন। যদিও লিখিত প্রস্তাবের পাশাপাশি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বশরীরে উপস্থিতিতে কমিশনের সাথে আলোচনা করতে পারলে প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তিসমূহ সবিস্তারে তুলে ধরা যেত। তারপরেও জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের দলের প্রস্তাব চাওয়ার জন্য আপনিসহ কমিশনের সকল সদস্য এবং কমিশনের কাজে সহায়তাকারী সকল স্টাফদেরকে আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রথমেই বলে নিতে চাই যে, সংবিধানের মতো দেশ ও জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংযোজন-বিয়োজন, পরিমার্জন-পরিবর্ধন এক কথায় সংশোধন করার এখতিয়ার শুধুমাত্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের, অর্থাৎ জাতীয় সংসদের। অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে একাজ করা সম্ভব না এবং এটা তাদের দায়িত্বের মধ্যেও পড়ে না বলে আমরা মনে করি। তবে জনমত সৃষ্টি করে নির্বাচিত সরকারের উপর চাপ প্রয়োগের হাতিয়ার হিসাবে সুপারিশ আকারে প্রস্তাবনা আসতে পারে। তবে তা জনমনে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে, নির্বাচিত সরকার কার্যকর না করলে জনগণের কিছু করার থাকে না। অতীতে এর বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭২ সালের সংবিধানে বেশ কিছু অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও অনেক ভালো কথা লিপিবদ্ধ ছিল, '৯০-এর গণ অভ্যুত্থানের পরে ১৯৯১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে অর্থ-বাণিজ্য, শিল্প-কৃষি, শিক্ষা-সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের ২২৫ জন দেশ বরেণ্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত ২৯টি টাস্কফোর্স এর মাধ্যমে সংস্কারের বেশ কিছু সুপারিশ করা হয়েছিল, ২০০৭ সালের এক এগারোর সরকার আমলেও সংস্কারের বেশ কিছু সুপারিশ করা হয়েছিল। তার কোনটাই বাস্তবায়ন হয় নাই।

আপনারা জানেন বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধানটি ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে গণআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে তৎকালীন গণপরিষদে ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর পাশ হয়েছিল এবং ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে তা কার্যকর হয়েছে।

'৭২ এর সংবিধানে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্রাজ্যবাদের কবলমুক্ত স্বাধীন জাতীয় বিকাশের অর্থে জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রীয় ৪ মূলনীতি হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছিল এবং মূল সংবিধানে মৌলিক অধিকার পরিপন্থি কোন আইন প্রণয়ন করা যাবে না বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। আপেক্ষিক অর্থে একটি বুর্জোয়া সংবিধান হিসেবে এর একটা গণতান্ত্রিক চরিত্র ছিল। যদিও ৫০ এর অধিক বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর স্বীকৃতি, পারিবারিক আইনের ক্ষেত্রে মুসলিম শরিয়া আইন এবং হিন্দু আইন দ্বারা পরিচালিত হওয়ার কথা থাকায় সম্পত্তির উত্তরাধিকারে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের স্বীকৃতি এবং অন্ন-বস্ত্র, শিক্ষা-চিকিৎসা, বাসস্থান ও কাজকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি এবং মৌলিক অধিকার ভাগে বর্ণিত অধিকারসমূহের আইনি সুরক্ষার বিষয়টি সংবিধানে লিপিবদ্ধ ছিল না এবং এখনও নাই। এটা '৭২ এর সংবিধানের অসম্পূর্ণতা বলে আমরা মনে করি। তাছাড়া '৭২ থেকে '২৪ পর্যন্ত সংবিধানকে ১৭ বার সংশোধন করা হয়েছে এর মধ্যে প্রথম, তৃতীয় এবং সকল রাজনৈতিক দলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে করা একাদশ সংশোধনী ছাড়া সকল সংশোধনীই অগণতান্ত্রিক ও স্বেচ্ছাচারী শাসন বলবৎ রাখার জন্য দলীয় ও ব্যক্তি স্বার্থে করা হয়েছে বলে আমরা মনে করি। উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৭৩ সালের ১৫ জুলাই থেকে দ্বিতীয় সংশোধনী কার্যকর হয়। ঐ দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে জনগণের সার্বভৌমত্বের জায়গায় সংসদ ও সাংসদদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা এবং নিপীড়নমূলক অগণতান্ত্রিক আইন প্রণয়নের রাস্তা প্রশস্ত করা হয়েছে। ঐ সংশোধনীর ফলেই বিশেষ ক্ষমতা আইন, সন্ত্রাস দমন আইন, জননিরাপত্তা আইন, ডিজিটাল সিকিউরিটি এ্যাক্ট ও সাইবার সিকিউরিটি এ্যাক্ট এর মতো নিবর্তনমূলক অগণতান্ত্রিক আইন প্রণয়ন করতে পেরেছে শাসক গোষ্ঠী। দ্বিতীয় সংশোধনীর ফলে সংবিধানের ৩৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কিত রক্ষাকবচ নাকচ হয়ে গেল। জরুরি আইন জারির বিধানও যুক্ত করা হয়েছিল এই সংশোধনীর মাধ্যমে।

চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বহু দলীয় ব্যবস্থা বাতিল করে একদলীয় বাকশাল ও সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতি চালু করেছিল।

পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে জেনারেল জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসনকে বৈধতা দেয়া হয়েছে এবং সংবিধানের শুরুতে বিসমিল্লাহ যুক্ত এবং চার মূলনীতি থেকে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দিয়ে সংবিধানের গণতান্ত্রিক চরিত্রকে পালটে সাম্প্রদায়িকীকরণ এর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই সংশোধনীর মাধ্যমে ১২ অনুচ্ছেদ বাতিল করা হয় যেখানে উল্লেখ ছিল সাম্প্রদায়িকতা, রাষ্ট্র কোন ধর্মকে পৃষ্ঠপোষকতা না করা। ৩৮ অনুচ্ছেদ বাতিল করে ধর্মের ভিত্তিতে কোন রাজনৈতিক দল করা, বা রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার করা যাবে না–তা রদ করা হয়।

সপ্তম সংশোধনীর মাধ্যমে স্বৈরশাসক এরশাদের সামরিক শাসনকে জায়েজ এবং অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঘোষণার মাধ্যমে সংবিধানের চরিত্র পুরো খোল-নলচে পরিবর্তন করে বিকৃত রূপ দেওয়া হয়েছে।

আর পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে শেখ হাসিনার সরকার রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি যেমন পুনরুজ্জীবিত করেছে একই সাথে সংবিধানের শুরুতে বিসমিল্লাহ ও রাষ্ট্রধর্ম ইসলামও বহাল রেখে এক জগাখিচুড়ির সংবিধান তৈরি করেছে।

আমরা বহুবার বলেছি সংবিধান কোন ধর্মগ্রন্থ নয়, যে এখানে বিসমিল্লাহ বা রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে একটি বিশেষ ধর্মের উল্লেখ সংবিধানে থাকতে হবে। কারণ মুসলমানদের কোরআন শরিফের পর সব থেকে প্রধান হাদিস বুখারি শরিফ, সেই মূল হাদিসের শুরু বিসমিল্লাহ দিয়ে হয়নি। নবীর বিদায় হজের ভাষণ বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু করেননি, মদিনা সনদের শুরুতে বিসমিল্লাহ নাই–তাহলে আমাদের সংবিধানে কেন এগুলো লাগবে। এসব করা হয়েছিল প্রধানত দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলাম ধর্মাবলম্বী মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের ধর্মীয় আবেগকে কাজে লাগিয়ে শাসকগোষ্ঠীর অগণতান্ত্রিক ও গণবিরোধী কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দেয়ার উদ্দেশ্যে। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অপরাপর ধর্মাবলম্বী মানুষদেরকে বাস্তবে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করা হয়। যেমনি করে শুধু বাঙালি জাতীয়তাবাদ বলে অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর স্বীকৃতি না দিয়ে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন, বিভক্তির রাজনীতি চালু করা হয়।

১. আমরা মনে করি, উল্লিখিত অসম্পূর্ণতাগুলো দূর করে এবং ২য়, ৪র্থ, ৫ম, ৭ম, ৮মসহ সকল অগণতান্ত্রিক সংশোধনী, ধারাসমূহকে বাতিল করে সংবিধানের গণতান্ত্রিক চরিত্র ফিরিয়ে আনা দরকার। এছাড়াও গণতন্ত্রের মূলকথা হলো ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, (Separation of power) অর্থাৎ আইনসভা, বিচার বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগের পৃথকীকরণ এবং সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা করা যাতে এক ব্যক্তির হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন না ঘটে, Balance of power থাকে। সংবিধানে এমন চেক এন্ড ব্যালেন্সের বিধান সন্নিবেশিত হওয়া দরকার।

২. সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদেরও সংশোধন দরকার, কারণ এতে সাংসদদের ব্যক্তি স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে। আমাদের মতে ৩টি বিষয় অর্থাৎ (১) আলোচনা-মতামতের পর বাজেট (অর্থবিল) পাশ করার সময় (২) জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত যথা বহিঃশত্রুর আক্রমণ তথা যুদ্ধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে (৩) সরকারের প্রতি অনাস্থা ভোটের সময় দলীয় হুইপ যাতে কার্যকর থাকে এটা রেখে ৭০ অনুচ্ছেদের সংশোধন করা প্রয়োজন মনে করি।

৩. রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার বিধান যুক্ত করা। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, এমপি কেউই দুইবারের বেশি নির্বাচিত হতে পারবে না এমন বিধান যুক্ত করা।

৪. দ্বৈত নাগরিক কেউ রাষ্ট্রপতি, এমপি, মন্ত্রী, মেয়র, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হতে পারবে না এমন বিধান রাখা। এমপি, মন্ত্রীদের যোগ্যতার মানদণ্ড সুনির্দিষ্ট করা। যেমন : চারিত্রিক ও নৈতিক স্খলনকারী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় যে বা যারা বিশ্বাস করে না, স্বাধীনতা বিরোধী, যুদ্ধাপরাধী, যারা সাম্প্রদায়িক ধ্যানধারণা পোষণ করেন, ঋণখেলাপি, অর্থ পাচারকারী, ফৌজদারী মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত হলে এবং সাজা ভোগের পর ৫ বছর পূর্ণ না হলে, সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের চাকুরিজীবীদের অবসর প্রাপ্তির ৩ বছর পূর্ণ না হলে, দলের সদস্য হওয়ার ২ বছর পূর্ণ না হলে ও দুর্নীতিবাজ কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি, এমপি, মন্ত্রী, মেয়র, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হতে পারবে না এমন বিধান রাখা।

৫. নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, মানবাধিকার কমিশন ইত্যাদিকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সদস্যদেরও যোগ্যতার মানদণ্ড উপরোক্তভাবে নির্ধারণ এবং সুনির্দিষ্ট আইন ও তার বিধানাবলে সাংবিধানিক কমিশন গঠন করে ঐ কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ দান করা।

৬. বিচার বিভাগের ক্ষেত্রেও বর্তমানের যোগ্যতা ১০ বছরের জজিয়াতি বা ১০ বছরের উকালতি করার যোগ্যতার মাণদণ্ড বাতিল করে সুনির্দিষ্টভাবে যোগ্যতার মানদণ্ড নির্ধারণের মাধ্যমে বিচার কমিশন বা জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে নিয়োগ দানের বিধান করা। নিম্ন আদালতসহ বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীন করা।

৭. বাংলাদেশের বিগত দিনে অনুষ্ঠিত ১২টি নির্বাচনের অভিজ্ঞতার আলোকে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচনকালীন তদারকি সরকার বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থা এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ৩ মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করবে এমন বিধান সংবিধানে যুক্ত করা।

৮. বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতি পরিবর্তন করে সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি চালু, না ভোটের বিধান এবং প্রতিনিধি প্রত্যাহার (Right to Recall), নির্বাচনে টাকার খেলা, পেশি শক্তি, সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা দূর, নির্বাচনী ব্যয় (যথা পোস্টার, লিফলেট, জনসভা, মাইক প্রচার ইত্যাদি) কমিশন কর্তৃক বহন করাসহ নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে সাংবিধানিক বাধ্য বাধকতা কঠোরভাবে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা।

৯. মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও '২৪ এর গণ অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী বৈষম্যহীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা এবং ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন পুনরুত্থান রোধে বর্তমান সংবিধানে লিপিবদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণায় বলা সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজি সুবিচারের অঙ্গীকার এবং রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসাবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সাম্রাজ্যবাদের কবল মুক্ত স্বাধীন জাতীয় বিকাশের অর্থে জাতীয়তাবাদ অক্ষুণ্ন রাখার প্রস্তাব করছি।

একটা কথা স্মরণ করা দরকার যে, ১৭ বার সংশোধন বা কাটাছেঁড়া করার পরেও এখনও পর্যন্ত সংবিধানে যে সব কথা লেখা রয়েছে যেমন–

(ক) সংবিধানের ২০ (২) অনুচ্ছেদে আছে রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করবে যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করতে সমর্থ হবে না, কিন্তু মানা হচ্ছে না।

(খ) সংবিধানের ১৭(ক) অনুচ্ছেদে লেখা আছে আইনের দ্বারা একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত সর্বজনীন, বৈষম্যহীন, একমুখী অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা এবং একই পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু মানা হচ্ছে না। বাস্তবে বর্তমানে প্রধানত ৩ ধারার যথা-সাধারণ শিক্ষা, কিন্ডার গার্ডেন (ইংলিশ মিডিয়াম, ইংলিশ ভার্সন) মাদ্রাসা শিক্ষা এবং প্রাথমিকে ১৩ ধারার শিক্ষা চালু আছে।

(গ) মালিকানার নীতি। সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদে লেখা আছে (ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা (খ) সমবায়ী মালিকানা (গ) ব্যক্তিগত মালিকানা। কিন্তু বর্তমানে চলছে উলটো; ব্যক্তি মালিকানা প্রধান খাত, সমবায়ী মালিকানা নাই, রাষ্ট্রীয়খাত ব্যক্তিখাতে হস্তান্তর করা হয়েছে।

(ঘ) সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে এখনও লেখা আছে দেশের অর্থনীতি হবে পরিকল্পিত অর্থনীতি, কিন্তু চলছে মুক্তবাজারী উদারনীতিবাদী অর্থনীতি (New liberal economic policy)

(ঙ) সংবিধানে ২৫ অনুচ্ছেদে লেখা আছে রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদ-ঔপনিবেশিকতাবাদ ও বর্ণ বৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সংগত সংগ্রামকে সমর্থন দেবে; কোন দেশ অন্য কোন দেশের উপর আগ্রাসন চালালে বাংলাদেশ তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবং দেশে দেশে স্বাধীনতার সংগ্রাম সমর্থন জোগাবে। কিন্তু ইরাক যুদ্ধসহ বিভিন্ন দেশে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র, সরকার ও সংসদ কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

(চ) সংবিধানের ১৮ অনুচ্ছেদে পতিতালয়-জুয়া বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার কথা আছে। কিন্তু পতিতাবৃত্তি আইনসঙ্গত ও জুয়াকে আইনি বৈধতা দেয়া হচ্ছে।

(ছ) ৩৫ অনুচ্ছেদের (ক) ধারায়, প্রত্যেক ব্যক্তির অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড প্রকাশ্য আদালতে দ্রুত বিচারের অধিকার থাকবে। কিন্তু র‍্যাব, চিতা, কোবরাসহ বিভিন্ন বাহিনীর ক্রসফায়ার, এনকাউন্টারে বিনা বিচারে মানুষ খুন করা হয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

সংস্কার প্রস্তাব : সংবিধান

সংবিধান সংস্কার কমিশনে বাসদের প্রস্তাব

১৮ পৃষ্ঠার পর

অনেকেই বর্তমান সংবিধানকে মুজিববাদী সংবিধান বলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইছেন, সংবিধান পুনর্লিখনের এবং সংবিধান বাতিল করে নতুন করে লিখার কথা যারা বলছেন আমরা তাদের সাথে একমত নই, কারণ বর্তমান সংবিধান মুজিববাদী সংবিধান নয়, মুজিববাদ বলে কোন কিছুর অস্তিত্বই বাংলাদেশে কখনো ছিল না বা বর্তমানেও নাই। এ ছাড়া অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুছে দিতে চান, নতুন প্রজন্মকে ইতিহাসের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছেন। এটা বন্ধ করা দরকার। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি জনযুদ্ধ। আওয়ামী লীগ এটাকে দলীয়করণ করেছিল এবং আওয়ামী লীগসহ গত ৫৩ বছরে সকল সরকারই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীতে সংবিধান লংঘন করে দেশ পরিচালনা করেছে। আওয়ামী লীগই সবচেয়ে বেশি সংবিধান লংঘন করেছে এবং অন্যদেরকেও সংবিধান লংঘনের পথ করে দিয়েছে। ফলে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করা এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ও চেতনা এবং '২৪ এর গণ অভ্যুত্থানের আকাঙ্খা নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা ও রক্ষা করতে হবে।

১৭ বার কাটাছিঁড়ার পরেও যে গণতান্ত্রিক নীতির কথাগুলো সংবিধানে এখনও লিপিবদ্ধ আছে তার বাস্তবায়ন নাই। সংবিধান সংশোধন, পুনর্লিখন বা নতুন সংবিধান যতো ভালো ভালো কথামালা দিয়ে লেখা হোক না কেন, যদি জনগণকে শিক্ষিত করা ও গণতান্ত্রিক চেতনা, মূল্যবোধ সম্পন্ন করা না যায়, গণতান্ত্রিক আইন-প্রথা, প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা নায় যায়, তাহলে যত ভালো কথা লিখলেও তা যে কার্যকর হবে না এটা বলাই বাহুল্য। তারপরেও আমরা মনে করি সংবিধানের যে কোন সংশোধনের ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের এবং '৭২ এর সংবিধানের উল্লেখিত রাষ্ট্রীয় ৪ মূলনীতি তথা সংবিধানের মৌলিক ভিত্তি অক্ষুণ্ন রেখে '২৪ এর গণ অভ্যুত্থানের বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের চেতনাকে ধারণ করতে হবে। ধর্ম-বর্ণ, লিঙ্গ, জাতিসত্ত্বার মধ্যে বৈষম্য করা চলবে না। অন্ন-বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও কাজকে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতিসহ বর্তমান সংবিধানের তৃতীয় ভাগে উল্লেখিত ২৬ অনুচ্ছেদ থেকে ৪৭ (ক) অনুচ্ছেদ পর্যন্ত মৌলিক অধিকার ভাগের আইনি সুরক্ষা অর্থাৎ নাগরিকের মৌলিক অধিকার ব্যক্তি, গোষ্ঠী, রাষ্ট্র কর্তৃক খর্ব বা হরণ করা হলে আইন বলে আদালত কতৃক বলবৎ করা যাবে এ ধরনের বিধান করতে হবে।

দেশের সকল সম্পদের উপর দেশের জনগণের শতভাগ মালিকানা নিশ্চিত করার নীতিমালা প্রতিপালন করার ভিত্তি হিসেবে গণ্য করতে হবে।

পরিশেষে বলতে চাই, আগেও বলেছি সংবিধান সংশোধন বা পরিমার্জন করার কাজটি রাজনৈতিক ফলে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে আলোচনা করে বোঝাপড়া তৈরি ও ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করেই সবার সম্মতিতে সংবিধান সংশোধনের একটি রূপরেখা বা প্রস্তাবনা সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে তুলে ধরতে পারে। যা পরবর্তী নির্বাচিত রাজনৈতিক সরকার বাস্তবায়ন করবে।

শিল্পকলায় নাটক বন্ধের নিন্দা
মুক্তভাবে সংস্কৃতি চর্চার পরিবেশ নিশ্চিতের দাবি

গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্য

গুটিকয়েক মানুষের বিক্ষোভের মুখে শিল্পকলা একাডেমিতে নাটকের প্রদর্শনী বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্য। ৫ নভেম্বর এক যৌথ বিবৃতিতে গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্যের অন্তর্ভুক্ত সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দ বলেন, এ ঘটনার মাধ্যমে দেশে সংস্কৃতি চর্চার পরিবেশকে বাধাগ্রস্ত করা হলো।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, ২ নভেম্বর দেশ নাটকের–নিত্যপুরান নাটকের প্রদর্শনী চলার সময় শিল্পকলা একাডেমির গেটের বাইরে বিক্ষোভ শুরু করেন একদল মানুষ। নাটকের দলটির একজন সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে স্লোগান দিতে থাকেন তারা। এক পর্যায়ে ভেতরে ঢুকতে চাইলে নিরাপত্তা বিবেচনায় নাটকের শো বন্ধের নির্দেশ দেন শিল্পকলার মহাপরিচালক সৈয়দ জামিল আহমেদ। গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্য মনে করে, এভাবে কোন নাটকের শো বন্ধ করে দেওয়া প্রগতিশীল সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে কোনভাবেই সহায়ক নয়। এর মধ্যদিয়ে কর্তৃপক্ষ একটা অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেছে যা মোটেও সমীচীন নয়। কেউ দোষী হলে বা অন্যায় করলে তাকে দেশের প্রচলিত আইনের মাধ্যমে বিচারের আওতায় আনাটাই যুক্তিযুক্ত কাজ। অতীতের ফ্যাসিবাদী শক্তি যেমন গায়ের জোর দেখিয়ে ত্রাসের রাজত্ব করেছে, ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে এরা সে পরাজিত শক্তিরই ভিন্ন রূপ। এর জন্য হাজারো মানুষ জীবন দেয়নি, রক্ত দেয়নি।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ছাত্র-জনতার অভূতপূর্ব গণ অভ্যুত্থানে স্বৈরাচারী সরকারের পতনের পর একটি বৈষম্যহীন সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা করছে মানুষ। যারা আন্দোলনে হতাহত হয়েছেন, তাদেরও অন্যতম লক্ষ্য ছিল বাক্স্বাধীনতা ও মুক্ত বুদ্ধির চর্চা সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করা। কিন্তু, ছাত্র-শ্রমিক-জনতার রক্তে অর্জিত বিজয়ের পর থেকেই কোন কোন গোষ্ঠী অনৈতিক সুবিধা নেয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। তারা প্রগতিবিরোধী, মানুষের মুক্তি চায় না। মানুষকে বিভ্রান্ত করে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করতে চায় তারা। নাটকের শো বন্ধের মতো কাজ বৈষম্যহীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অন্তরায় বলে মনে করেন গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্যের নেতৃবৃন্দ।

দেশে অবিলম্বে সংস্কৃতি চর্চার অবাধ ও মুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতের দাবি জানান গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্যের নেতৃবৃন্দ। একইসাথে যারা মানুষের মুক্তিতে বিশ্বাসী তাদেরকে ঘরে বসে না থেকে প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার আহ্বানও জানান তারা। মানুষের মুক্তির সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে বলেও বিবৃতিতে জানানো হয়।

পুঁজিবাদী নিয়ম বহাল রেখে শোষণ-বৈষম্যের অবসান সম্ভব নয়

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

খারাপ জিনিসকে গালি দিলেই ভালো জিনিস হাজির হয় না। ভালোর জন্য ভালো কিছু নির্মাণের দৃষ্টান্ত হাজির করতে হবে। এই ব্যাপারে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে হবে। বামপন্থিরা এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারবে কি না সেটাই বড় কথা। বামপন্থিরাই এবং বামপন্থাই একমাত্র ভবিষ্যৎ। এটা আমরা পারবো কি না সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু যা চলছে তার তো কোন ভবিষ্যৎ নাই। দেখলাম ৫৩ বছর। দেখার পরে কি বলতে পারব দেশের দক্ষিণপন্থার উপর নির্ভর করে দেশের ভবিষ্যৎ হবে? হবে না। আমরা পারবো কি না সেটা ভিন্ন বিষয় কিন্তু আমরা মনে করি সবাই মিলে যদি আমরা চেষ্টা করি তাহলে অবশ্যই পারবো। অতীত থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। আমাদের ভুলভ্রান্তিগুলি অকপটে স্বীকার করে আসেন আমরা একযোগে কাজ করি। একদল হতে হবে তার দরকার নাই কিন্তু এক মত হয়ে একসাথে হাঁটি, একসাথে চলি।

বাসদ রংপুর জেলা আহ্বায়ক কমরেড আব্দুল কুদ্দুসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা কমরেড খালেকুজ্জামান, বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. সৈয়দ মামুনুর রহমান, সমাজকর্মী মাজিরুল ইসলাম লিটন, বাংলাদেশ জাসদ-রংপুর মহানগর সভাপতি গৌতম রায়, সাংবাদিক কামরুল হাসান টিটু, বাসদ সমর্থক শহীদুল ইসলাম, মোজাম্মেল হক, গণস্বাস্থ্য অধিকার আন্দোলনের সদস্যসচিব বেলাল আহমেদ, বাসদ (মাহবুব) নেতা আব্দুর সবুর জেবলিন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মী নাফিজ ইকবাল প্রমুখ।

৯ ডিসেম্বর '২৪ বেগম রোকেয়ার ১৪৪তম জন্ম ও ৯২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেগম রোকেয়ার ভাস্কর্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট

কার্তিক চন্দ্র সরকার এর মৃত্যুতে শোক

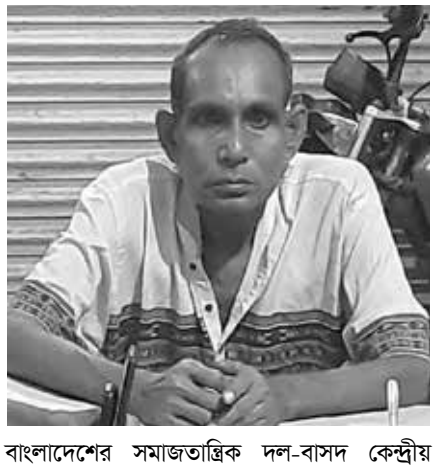

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ১০ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বাসদ গাইবান্ধা জেলা কমিটির সদস্য এবং সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট সদর উপজেলা শাখার আহবায়ক কমরেড কার্তিক চন্দ্র সরকারের মৃত্যুতে গভীর শোক ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে কমরেড ফিরোজ বলেন, কার্তিক চন্দ্র শ্রমিক-কৃষক ও মেহনতি মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে সংগ্রামী দল বাসদের পতাকাতলে শ্রমজীবীদের ঐক্যবদ্ধ করা ও সংগ্রাম করার জন্য পার্টির প্রতিষ্ঠাকাল থেকে দলের সাথে যুক্ত থেকে কাজ করেছেন।

তার মৃত্যুতে দেশ একজন মেহনতি মানুষের বন্ধুকে এবং বাসদ একজন সংগঠককে হারালো। কমরেড ফিরোজ তাঁর স্বপ্ন—শোষণ-বৈষম্যমুক্ত সাম্যের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এগিয়ে নেয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, কার্তিক চন্দ্র দীর্ঘ দিন বিভিন্ন জটিল রোগে ভুগে ১০ নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

শেখ সাদী ভূঁইয়ার মৃত্যুতে শোক

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ১০ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরাম খুলনা জেলা শাখার অন্যতম সংগঠক, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের ভাস্কর্য ডিসিপ্লিনের শিক্ষক, '৯০-এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের ছাত্র নেতা, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক নেতা, লেখক-গবেষক-শিল্পী শেখ সাদী ভূঁইয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

কমরেড ফিরোজ বলেন, শেখ সাদী ছাত্র জীবনে গণতন্ত্র ও সাম্য সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ছাত্র ফ্রন্টের রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সময় প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরামে যুক্ত থেকে শিক্ষার সমস্যা সমাধানের আন্দোলনে ভূমিকা রাখেন।

১০ ডিসেম্বর ভোরে শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যু এদেশের প্রগতিশীল চিন্তার আন্দোলনে এক অপূরনীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

বিপ্লবী রাজনীতি হচ্ছে সমাজ প্রগতির পথে উৎসর্গীকৃত একটি জীবনবোধ

বীর মুক্তিযোদ্ধা হাবিব উল্যা চৌধুরী স্মারকগন্থের মোড়ক উন্মোচন

বীর মুক্তিযোদ্ধা, রাজনীতিবিদ ও বিশিষ্ট সমাজসেবক অ্যাডভোকেট হাবিব উল্যা চৌধুরী স্মরণে রচিত '*মৃত্যুঞ্জয়ী হাবিব উল্যা চৌধুরী স্মারকগ্রন্থে*'র মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান ৯ নভেম্বর '২৪ কবি নজরুল ইনস্টিটিউট কুমিল্লা কেন্দ্র মিলনায়তনে বিনয় সাহিত্য সংসদের আয়োজনে এ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কুমিল্লা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. মো. নিজামুল করিম, মুখ্য আলোচক বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা, বীর মুক্তিযোদ্ধা কমরেড খালেকুজ্জামান। তিনি গ্রন্থের মোড়কও উন্মোচন করেন।

বিনয় সাহিত্য সংসদের সভাপতি অধ্যাপক ডা. মোসলেহ উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে ও নবাব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক কামরুন্নাহার জেসমিন সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় আরও বক্তব্য রাখেন বাংলা একাডেমির গবেষণা কর্মকর্তা মামুন সিদ্দিকী, বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী বদরুল হুদা জেনু, সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সাংবাদিক মোতাহার হোসেন মাহবুব, হাবিব উল্যা চৌধুরীর কন্যা শ্রাবণী চৌধুরী।

কমরেড খালেকুজ্জামান সভার সভাপতি, অতিথি এবং উপস্থিত সকলকে সংগ্রামী অভিনন্দন এবং আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, কমরেড হাবিব উল্যা চৌধুরীর সাথে আমার প্রায় ৫৫ বছরের পরিচয়। এ দীর্ঘ সময়ের সমস্ত বিষয়তো দূরে থাকুক একটি সংক্ষিপ্ত অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করতে গেলেও বেলা বয়ে যাবে। যে গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন হলো তাতে আমার লেখা খুবই সংক্ষিপ্ত বলে একজন মন্তব্য করেছেন। আসলে স্মারকগ্রন্থে অনেকের লেখা যাবে তা বিবেচনায় ছিল। তার দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলি এতোটাই খোলামেলা ছিল যেখান থেকে অজানা বের করা কঠিন। হাবিব উল্যা চৌধুরীকে কেন আমরা স্মরণ করবো? কী প্রয়োজন? এ প্রয়োজনটা এ সময়ে অনেক গুরুত্ব নিয়ে দেখা দিয়েছে। কারণ এখন ব্যতিক্রম বাদে রাজনীতিবিদ শুনলে মানুষের চোখের সামনে যে ছবিটা ভেসে উঠে, এটা লজ্জার, বিবেকের উপর পীড়ার এবং আমাদের জাতির ইতিহাসের জন্য কলঙ্কজনক অধ্যায়। আজকে যখন দেখা যায় মন্ত্রী-এমপিরা পালিয়ে যাচ্ছে, কথিত জনপ্রতিনিধি প্রায় ৬৬ হাজারের মতো এদের নিচ থেকে শুরু করে পার্লামেন্ট পর্যন্ত বেশির ভাগই পলাতক। তাদের সম্পর্কে জনগণের যে ধারণা হচ্ছে যে, এরা লুণ্ঠনকারী এবং গণবিরোধী গণ অভ্যুত্থানে উচ্ছেদ হওয়া সরকারের সহযোগী। সেই সময়ে হাবিব উল্যা চৌধুরীর মতো মানুষদের স্মরণ করা খুব বেশি দরকার। কারণ হাবিব উল্যা চৌধুরী এ ক্যাটাগরির মধ্যে পড়েন না। রাজনীতি হচ্ছে সমাজ সচেতনতা। রাজনীতি করার মানে হচ্ছে সমাজের জন্য, প্রগতির পথে মানুষের জন্য জীবন উৎসর্গীকৃত করা একটি জীবনবোধ। একটি ভ্রান্তির কথা একটু বলি, অনেকেই বলে যে, আমি রাজনীতি করি না, ভুল কিংবা বিরক্তি বশত হয়তো বলেন; রাজনীতি করেন না বা বুঝেন না, অর্থাৎ নিজেকে সমাজ সচেতনার বাইরে নিয়ে যান। আসলে তারা বলতে চান তারা কোন রাজনৈতিক দল বা কোন সংগঠন করেন না। এই একাকার করার কাজটা অনেক শিক্ষিত মানুষও করেন। আপনি নিজে যখন বলেন, আমি রাজনীতি করি না, তার মানে আপনি নিজেকে একজন অসচেতন মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং সেটা কোন গৌরবের-সম্মানের বিষয় না। এখানে হাবিব উল্যা চৌধুরীর কথা বলা হয়েছে, উনি বিশেষ করে যখন সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে ষাটের দশকে যে নিউক্লিয়াসের জন্ম হয়েছিল তিনি সেই নিউক্লিয়াসের একজন সদস্য ছিলেন। এবং যখন ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের মতো একটা বুর্জোয়া দল, সেই দলের ছাত্র সংগঠনে প্রস্তাব আসলো স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশের। এটা সাধারণ শ্রেণিগত অবস্থানের বাইরের একটা ঘটনা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। ছাত্রলীগ নেতা স্বপন চৌধুরী যিনি '৭১ সাল শহিদ হয়েছেন, তাকে দিয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়, এবং এই প্রস্তাবের পেছনে যারা মূল শক্তি ছিলেন, আ. স. ম. আব্দুর রবসহ সংখ্যাগুরিষ্ঠদের সাথে হাবিব উল্যা চৌধুরী অন্যতম উৎসাহী ছিলেন। পরে যে ১৯৭১ সালের ২রা মার্চ আ. স. ম আব্দুর রব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কল্পিত বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। সেই পতাকার নকশা তৈরি করার পেছনে এই কুমিল্লার শিবনারায়ণ দাস এর ভূমিকা ছিল। আপনারা শুনেছেন যে, শিবনারয়ণকে রাজনীতিতে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে হাবিব উল্যা চৌধুরীর ভূমিকা ছিল। তখন কিন্তু পাকিস্তান আছে এবং স্বাধীন দেশের পতাকা উত্তোলন করা হচ্ছে। তাহলে যদি সেই স্বাধীনতা না আসতো, তাহলে কী হতো? রাষ্ট্র দ্রোহিতায় এদের ফাঁসি হতো। এবং তার পরে ৩ তারিখে পল্টনে স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করা হয়। সে ইশতেহারে বলা হয়েছে, আমরা একটা স্বাধীন দেশ চাই, স্বাধীনতা চাই, যে স্বাধীন দেশ হবে শ্রমিক রাজ, কৃষক রাজ। তাহলে সেই সময়ে এই যে ঘটনাবলি আর অঙ্গীকারনামা, এগুলো বাদ দিয়ে, এখন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যত কথাবার্তা হচ্ছে তাতে অনেক অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, শুধুমাত্র নয় মাসের ইতিহাস নয়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস কমপক্ষে আড়াই শ বছরের সংগ্রামের ধারাবাহিকতার। তার পূর্ণ পাঠোদ্ধার আজও হয়ে উঠেনি। আগের ইতিহাসগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করবো না। আফগান-মোগল, ব্রিটিশ দখল ও শাসনের অভিঘাতে সম্প্রদায় থেকে জাতি গঠন প্রক্রিয়া, তার পরিপূরক সমাজ মনস্তত্ত্ব গঠন, বিভিন্ন সম্প্রদায়, সম্প্রদায়ে যে বিরোধ-ঐক্য, ঐক্যের মধ্য দিয়ে একটা জাতি গঠনের প্রক্রিয়া, এর বহু বিষয় তার সাথে যুক্ত। সেই অধ্যায় বাদ দিলেও আড়াই শ বছর আমাদের সংগ্রামের ইতিহাস। এখানে একটা পরিবার বা কোন একটা গোষ্ঠীর বয়ানে তা সীমিত করা যায় না। ফলে আজ মনে রাখবেন যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ছিল জনযুদ্ধ। এই কথাটা আজকে অনেক জানা মানুষ, অনেক শিক্ষাবিদরাও আলোচনা করেন না। ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭১ মার্চ পর্যন্ত নেতৃত্বের শীর্ষে আওয়ামী লীগ পৌছে যায়। কিন্তু সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ শুধু আওয়ামী লীগের যুদ্ধ ছিল না। সেখান থেকে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে যে, মুক্তির জনযুদ্ধও ছিল আওয়ামী লীগের যুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্র ও ১৯৭২ সালের সংবিধান ছিল আওয়ামী লীগের সংবিধান ইত্যাদি। এগুলো ভুল কথা। এই যুদ্ধকে কেন বলছি জনযুদ্ধ? কারণ খেয়াল করবেন, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ যখন এই যুদ্ধ শুরু হয়, প্রথমে ইপিআর, পুলিশ এবং আর্মি যারা বাঙালি অস্ত্র ধরেছিল, কিন্তু ১০ এপ্রিলের মধ্যে সবাই ভারতে চলে যান। তারা দেশের মাটিতে টিকেন নাই। সেভাবে তাদের প্রস্তুতির নির্দেশনাও ছিল না এবং শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান নেতা গ্রেপ্তার বরণ করলে তাকে পাকিস্তানে নিয়ে যায়। আর বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনার যে সরকার, সে সরকারও ছিল ভারতে। দেশে জনগণের কোন সরকার ছিলো না। দেশে যে সরকার, সেটা হলো পাকিস্তানি উপনিবেশের গণহত্যাকারী সরকার। তাহলে এই সময় মার্চ-এপ্রিল, মে-জুন; যখন এই মুক্তি বাহিনী ট্রেনিং নিয়ে ফিরে, এই ৪/৫ মাস প্রতিরোধ কে করেছিল? কারা করেছিল? সেই সময় নিরস্ত্র জনগণ, জীবন বাজি রেখে প্রতিরোধ করেছিল। তারা লড়াই না করলে যুদ্ধ থেমে যেত। আজকে ৩০ লাখ, ১৫ লাখ এটা নিয়ে বিতর্ক করার দরকার নই। সরকার ৩ লাখ শহিদের নামও তালিকা করে নাই। প্রধান যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে জিডি কিংবা মামলা পর্যন্ত করে নাই। যে কারণে যুদ্ধাপরাধী সংগঠন জামায়াতে ইসলাম তাদের এই যুক্তিতে নিরপরাধ দাবি করে এবং তাদের বিচারকে জুডিশিয়াল কিলিং বলে দাবি করে। কিন্তু আওয়ামী লীগের দায়িত্বহীনতার কারণে এদের যুদ্ধাপরাধ নাকচ হয়ে যায় না। এই যে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিল এরা কারা? আজকে যারা হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছেন তাদের পরিবারের কয়টা লোক আছে? আমি-সহ ঐ সময় যারা ভারতের ত্রিপুরার অম্পিনগর মেলাঘর এবং নির্ভরপুরে ট্রেনিং নিয়েছে, এদের লিস্ট আমার জানার সুযোগ ছিল; আমি মাত্র ২ জন পেয়েছি উচ্চবিত্ত, স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারের। আর বাকিরা ছিল শ্রমিক-কৃষক মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। এরাই যুদ্ধ করেছে। কিন্তু যারা যুদ্ধ করলো, ১৬ ডিসেম্বরের পরে একটা সিক্সটিন ডিভিশন বাহিনী তৈরি হইলো; এরা যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত ছিল না, এবং এর পরে দেখা গেল, সার্টিফিকেট কেনাবেচা শুরু হয়ে গেলো। আমি প্রথম সার্টিফিকেট নেই-নি। কিন্তু যেহেতু কুমিল্লা জেলার দায়িত্বে আমি ছিলাম, তাই আমার নাম বাদ দিয়ে তো আর লিস্ট করতে পারে না। সেই জন্য ওরা মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় থেকে লিস্টে আমার নাম দিয়ে পরে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি মুক্তিযোদ্ধা ভাতা নেই না। হাবিব উল্যা চৌধুরী সার্টিফিকেটও নেননি। উনি তো নির্বিকার মানুষ।

যে জনযুদ্ধ সেটাকে আজকে যখন আওয়ামী লীগের যুদ্ধ বানিয়ে দিচ্ছেন, এটা তো ভুল ইতিহাস। আবার আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের যতটুকু ভূমিকা ছিল তাকে অস্বীকার করাটাও ভুল ইতিহাস। আওয়ামী লীগ বিশেষ করে মুজিব পরিবার মুক্তিযুদ্ধকে পকেটস্থ করে জাতীয় সম্মান সম্পদ সবকিছুকে এককভাবে পকেট ভারী করতে গিয়ে আজ যেমন চরম ধিক্কার আর অসম্মানের লাঞ্ছনা নিয়ে বিতাড়িত। আমরা যুদ্ধ করেছি, শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বকে সামনে রেখে যুদ্ধ হয়েছে; এটা অস্বীকার করা যাবে না। এটা যেমন সত্য, তেমনি মুক্তিযুদ্ধ যে জনযুদ্ধ, এটা আওয়ামী লীগের বা কোন একটি পরিবারের যুদ্ধ নয়, এটাকেও পাশ কাটানো যাবে না। ইতিহাস ওইভাবে আনতে হবে। এবং এর সঙ্গে যে কতগুলো কথা চলে আসছে। ঐ সময় ৯০ ভাগ মুসলমান ছিল বাংলাদেশে। ১% এরও কম ছিল, মুসলমান রাজাকার-আলবদর। তাহলে মুসলিমরা ছিল অসাম্প্রদায়িক। এই ৯০ ভাগ মুসলমান যদি অসাম্প্রদায়িক না হতো, দেশ স্বাধীন হতো না। এই ১ ভাগের চেতনায় যদি মুসলমানরা থাকতো, তাহলে আমরা আজও পাকিস্তান থাকতাম। এই কথাটা এখন বলা সময় হয়েছে। আপনারা জানেন হাবিব উল্যা চৌধুরীর স্ত্রী মুক্তিযোদ্ধা মমতাজ বেগম। মমতাজ বেগম সম্পর্কে আপনারা জানেন। আপনারা জানেন ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে ডামি রাইফেল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে, ঢাকার রাজপথে, সদম্ভ কুচকাওয়াজ হয়েছিল তার প্রথম সারির ছবিতে মমতাজের ছবিটা আজও উজ্জ্বল সাক্ষী। ১৭ মার্চ ১৯৭৪ যখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বাস ভবনের সামনে জাসদ এর মিছিলে গুলি হয়, মমতাজ বেগম তখন নিজের জীবন বিপন্ন করে আ. স. ম. আব্দুর রব, মেজর জলিলকে রক্ষা করার জন্য সমানে এগিয়ে গিয়েছিলেন। যদি মমতাজ বেগম এভাবে না এগুতেন তাহলে এরা হয়তো আরও বেশি আহত হতেন। সেই সব এখন জাসদের ভুলে যাওয়া আন্দোলনের ইতিহাস হয়ে আছে। আরেকটি কথা বলি। মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং শুরুর প্রথম দিকে ভারতে মেয়েদের একটা সামরিক ট্রেনিং সেন্টার শুরু করা হয়েছিলো। মতিয়া চৌধুরী, মমতাজ বেগমসহ অনেক নারীরা ট্রেনিং নিচ্ছিল, কিন্তু কিছু দিন পর তা বন্ধ করে দেওয়া হলো। এ প্রশ্নের জবাব কিন্তু কোন দিন আওয়ামী লীগ দেয় নাই। কারা এটা বন্ধ করেছে? পরে বললো যে, নারী কর্মীরা স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে গিয়ে সাহায্য করুক, সাংস্কৃতিক টিমের সঙ্গে থাকুক। এদের ট্রেনিং হয়নি কেন? এ প্রশ্নের জবাব কিন্তু এখনও নাই। এবং এর সঙ্গে যে কথাটা আসছে, আমাদের নারীরা শুধু ধর্ষিত হয়েছে বিষয়াটা তা নয়। দা-কাস্তে, কুড়াল নিয়ে, মহিলারা প্রতিরোধ তৈরি করেছিল। এরকম অসংখ্য ঘটনা আছে। তারা প্রতিরোধ করতে গিয়ে বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হয়েছে। আরেকটা ভুল করা হচ্ছে–আমি যদি গুলিবিদ্ধ হই, আঘাত প্রাপ্ত হই বা কোন অঙ্গহানী হই; সেটা কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের অংশ। তাহলে নারীদের উপর হানাদার বাহিনী শারীরিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন

এর পর পৃষ্ঠা ২১ কলাম ১

সংস্কার প্রস্তাব : দুর্নীতি দমন কমিশন

সংস্কারের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনে দেওয়া বাসদের প্রস্তাব

আমরা সবাই জানি, দুর্নীতি অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে একটি জাতিকে ধ্বংস করে। দুর্নীতির কারণে শুধু অর্থনৈতিক ক্ষতি নয় একটি দেশের ভবিষ্যৎ বিপন্ন হয়ে পড়ে। মানুষের অধিকার ও চরিত্র ধ্বংসের ক্ষেত্রে দুর্নীতি যেন নীরব ঘাতক। একদল দুর্নীতিবাজের কারণে দেশের সাধারণ মানুষের অন্ন-বস্ত্র, শিক্ষা-চিকিৎসা, বাসস্থান-কাজের অধিকার শুধু খর্ব হয় তাই নয়, দেশের বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের উপর মারাত্মক প্রভাব পড়ে। নির্বাচন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে আর গণতান্ত্রিক অধিকার বিপন্ন হয়ে পড়ে দুর্নীতির কারণে।

দুর্নীতি এমন এক ব্যাধি যা শোষণ এবং বৈষম্যমূলক আর্থসামাজিক ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত। এটা ছোঁয়াচে রোগের মতো সংক্রমিত হয়ে রাষ্ট্র ও সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এমন ক্ষত তৈরি করেছে যে, বাংলাদেশ রাষ্ট্র আজ দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। একে রোধ করতে না পারলে সভ্যতার সাথে তাল মিলিয়ে দেশের জনকল্যাণ ও উন্নতি-অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি সাধন করা সম্ভব নয়। তাই রাষ্ট্র, সরকার, প্রশাসন ও নাগরিকদের ঐক্যবদ্ধভাবে দুর্নীতি প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে হবে। এ জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন ও বিচার ব্যবস্থাকে যেমন ঢেলে সাজাতে হবে তেমনি প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

জুলাই-আগস্টের অভূতপূর্ব গণ অভ্যুত্থানে দেড় হাজার ছাত্র-শ্রমিক-জনতার শহিদি মৃত্যুবরণ ও প্রায় ৩০ হাজার মানুষের আহত হওয়ার মাধ্যমে ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকার পদত্যাগ ও দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছে এবং অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্বভার গ্রহণ করে রাষ্ট্র-প্রশাসন ও আইনের বিভিন্ন সংস্কারের জন্য ১১টি কমিশন গঠন করেছেন।

দুর্নীতি রোধ করা রাষ্ট্র-সমাজের জন্য অতীব জরুরি বিষয়। দুর্নীতি রোধে যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন ও দুর্নীতি দমন কমিশনের সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কমিশনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সুশীল সমাজসহ অংশীজনের মতামত/ প্রস্তাব আপনারা গ্রহণ করছেন। আমাদের জোট বাম গণতান্ত্রিক জোটের কাছেও প্রস্তাব চেয়ে চিঠি দিয়েছেন। এজন্য আপনাকেসহ কমিশনের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এবং স্টাফদেরকে আমাদের পার্টি বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাম গণতান্ত্রিক জোটের অন্যতম শরীক দল এবং জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী একটি দায়িত্বশীল নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল হিসেবে আমরা নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ তুলে ধরছি।

১. সংবিধানের ২০ (২) অনুচ্ছেদে লেখা আছে, সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবে না। অনুপার্জিত আয় মানে কালোটাকা অর্থাৎ দুর্নীতির টাকা, ঘুষের টাকা, কালোবাজারি-মজুতদারি ও বাজার সিন্ডিকেটের মাধ্যমে অবৈধভাবে অর্জিত টাকা, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজির মাধ্যমে অর্জিত টাকা, ব্যাংক ঋণ আত্মসাৎ বা ব্যাংক ডাকাতির টাকা। ফলে সংবিধান মেনে দুর্নীতি বন্ধে আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও তা দলীয় বিবেচনা ব্যতিরেকে কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

২. দুর্নীতি রোধে প্রণীত আইন বাস্তবায়নের জন্য স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করতে হবে। দুর্নীতি দমন কমিশনকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান ও দলীয়, রাষ্ট্রীয় এবং সরকারের হস্তক্ষেপমুক্ত নিরপেক্ষ, স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে। সাংবিধানিক কমিশনের মাধ্যমে কমিশনের সদস্যদের যোগ্যতার মানদণ্ড নির্ধারণ সাপেক্ষে দুর্নীতি দমন কমিশনের সদস্যদের নিয়োগ দিতে হবে। উল্লেখ্য যে ইতিপূর্বে দুর্নীতি দমন কমিশনের একজন প্রধান, কমিশনকে নখদন্তহীন বলে উল্লেখ করে দুর্নীতি দমনে তাদের অসহায়ত্বের কথা প্রকাশ করেছিলেন। ফলে সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবে এমন সুপারিশ করতে হবে যেন ভবিষ্যতে কমিশন নখ দন্তহীন না হয়।

৩. কমিশনের সদস্যদের যোগ্যতার মানদণ্ড হতে হবে সততা, নীতিপরায়ণতা, দক্ষতা ও যোগ্যতা। ঋণ খেলাপি এবং অতীতে অর্থনৈতিক অসততার অভিযোগ থাকলে কেউ এই দায়িত্বপূর্ণ পদে থাকতে পারবেন না।

৪. সরকার, মন্ত্রী-এমপিসহ রাষ্ট্র-প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও নাগরিকদের সকলের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

৫. খেলাপি ঋণ ও ঋণ খেলাপি বাণিজ্যের কুপ্রথা থেকে জাতিকে মুক্ত করতে হলে আইনের কঠোর প্রয়োগ বাঞ্চনীয়। খেলাপি ঋণের মামলা বছরের পর বছর ঝুলিয়ে অনাদায়ী রাখা ও ঋণ খেলাপিদের প্রশ্রয় দেওয়ার চলতি ব্যবস্থা বন্ধ করে খেলাপি ঋণের মামলার জন্য পৃথক খেলাপি ঋণ আদালত প্রতিষ্ঠা করা এবং ৩ থেকে ৬ মাসের মধ্যে মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করতে হবে।

৬. দুর্নীতি ও অর্থ পাচারের মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য পৃথক দুর্নীতি দমন আদালত প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং দুর্নীতির মামলা ৬ মাস থেকে ১ বছরের মধ্যে উচ্চ আদালতে আপিলসহ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে রায় দিতে হবে। দুর্নীতি দমন আদালত, খেলাপি ঋণ আদালত ও অন্যান্য আদালতের বিচারকদেরকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচার কাজ সম্পাদনের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। কারণ ইতিপূর্বে সর্বোচ্চ আদালতের একজন প্রধান বিচারপতি বলেছিলেন, বিচারকদের হাত পা বেঁধে পানিতে সাঁতার কাটতে দিলে ন্যায় বিচার নিশ্চিত হবে কীভাবে? এ থেকে শিক্ষা নিয়ে সংস্কার প্রস্তাব/ সুপারিশ করবে দুদক সংস্কার কমিশন এটাই দেশবাসীর প্রত্যাশা।

৭. ঋণ খেলাপি, সিন্ডিকেট ব্যবসায়ী, অর্থপাচারকারীদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও বিচারের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। খেলাপি ঋণ ও পাচারের টাকা উদ্ধার করে শিক্ষা-স্বাস্থ্য, কৃষি-সামাজিক সুরক্ষা খাতে বরাদ্দের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. রাষ্ট্রীয় ও জনগণের সম্পদ যথা নদী, খাল-বিল, জলাশয়, বন ও খাসজমি অবৈধভাবে দখল-দূষণের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অবৈধ দখলদারদের কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় তথা জনগণের সম্পদ উদ্ধারে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

রাজনীতি হচ্ছে সমাজ প্রগতির পথে উৎসর্গীকৃত একটি জীবনবোধ

২০ পৃষ্ঠার পর

ইত্যাদি হলে পরে সেটাও কী মুক্তিযুদ্ধের অংশ নয়? কই তাদের তো মুক্তিযোদ্ধা বলে স্বীকার করেননি সরকার। তাহলে বীরাঙ্গনা বলে একটা কথার মধ্য দিয়ে ছেড়ে দিলেন। তার ব্যাখ্যা কী? বীরাঙ্গনারা কি মুক্তিযুদ্ধের অংশ নয়? তা তো হিসাবের খাতায় এলো না। তাহলে জনসংখ্যার অর্ধেক নারীর অংশ হিসেবে একদিন ডামি রাইফেল উচিয়ে যারা রাজপথে মিছিল করলো এবং যারা ঐ সময় প্রায় তিন/ চার মাস হানাদার বাহিনীকে মোকাবিলা করতে গিয়ে নির্যাতন-নিপীড়িত হলো তাদেরকে তো যোদ্ধার কাতারে অন্তর্ভুক্ত করলেন না। অথচ কি হলো, ৬ জন সচিব তারা মুক্তিযুদ্ধ তো করেই নাই, সার্টিফিকেট নিয়ে তারা প্রমোশন নিয়েছেন। এর চেয়ে লজ্জার কিছু আছে? প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরের লোকজন। তাদের বিরুদ্ধে এখনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। মুক্তিযোদ্ধা তালিকা কি সঠিকভাবে হয়েছে? হয়নি।

৭২ থেকে ৮০ হাজার হবে ইন্ডিয়ান ট্রেনিং প্রাপ্ত। এবং এর পরে সবটা মিলে সোয়া লক্ষ তার তালিকাটাও ঠিক মতো করা হয়নি। প্রথম ইন্ডিয়া থেকে তারা একটা লিস্ট পাঠিয়েছেন, যে কারা কারা ওখানে ট্রেনিং নিয়েছে। হিসাব করলে তো কোন অসুবিধা নাই। এটা জানা কথা। দেশের ভিতরের প্রশ্নে প্রথম কথা হলো, দেশে সাড়ে সাত কোটি মানুষ মুক্তিযোদ্ধা, কিছু রাজাকার-আলবদর বাদে। এটা আগে স্বীকার করতে হবে। বলতে হবে যে তৎকালীন আমাদের বাংলাদেশে সমস্ত মানুষ হলো মুক্তিযোদ্ধা। তাদের অংশ হিসেবে অগ্রবাহিনী হিসেবে যারা যুদ্ধ করেছেন তাদের প্রকৃত সংখ্যা সেটা কিন্তু ঠিক করা হয়নি। ফলে এটা অনেকটা একটা সুবিধা বিতরণের প্রচারপত্রে পরিণত হয়েছে। এটা মুক্তিযুদ্ধকে অসম্মান করা।

এখানে ধর্ম নিয়ে একজন কিছু মতামত দিলেন। আমি এ বিষয়ে বলতে চাই না। কার্ল মার্কসের মতে ধর্ম হলো নিপীড়িত মানুষের দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন পৃথিবীর হৃদয় এবং আত্মাহীন অবস্থার আত্মা। আবার এই ধর্মই কালের প্রবাহে নিপীড়িত মানুষের উপর দমন পীড়নের হাতিয়ারে পরিণত হয়। শোষক শ্রেণি সংগ্রামী মানুষকে ধর্মীয় আফিম পান করিয়ে নির্জীব করে রাখার চেষ্টা করে। ইতিহাসে তার সাক্ষ্য রয়েছে। ইসলামি ধর্ম মতে ৪টা আসমানি বিতাবে ঈমান না আনলে খাটি মুসলমান হওয়া যায় না। সে হিসাবে খাটি মুসলমান পাওয়া কঠিন। ধর্ম সম্পর্কে আমার জ্ঞান খুবই কম। তাই সে আলোচনা বা বিতর্কে আমি যেতে চাই না। তবে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের কুফল যে কত মর্মান্তিক তা তো আমাদের জীবনে দেখেছি। গত ৫৪ বছরের শাসনে সব শাসক দল এ কাজ করেছে। ১৯৭১ সালে ধর্মের নামে জামায়াতে ইসলামী তো গণহত্যার সহযোগী ছিল। ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার শুধু ধর্মীয় মূল্যবোধকেই নষ্ট করে না, সকল প্রকার গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল নীতি, মূল্যবোধকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। এক সরকার এসে সংবিধানের মাথায় বিসমিল্লাহ বসায়, আরেক সরকার ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম বানালো। সর্বশেষ গণ অভ্যুত্থানে উচ্ছেদ হওয়া সরকার দুটোকেই সাজিয়ে দুঃশাসনের শোভা বর্ধন করেছিল। কওমি জননী সেজেছিল আবার হিন্দুবাদী প্রতিবেশী সরকারের পূজারিও বনেছিল।

দুনিয়া জুড়ে আজকের দিনের বুর্জোয়া শ্রেণির নীতিগত বুলি কপচানোর বাইরে নীতিনিষ্ঠ থাকার সুযোগ নাই। কারণ জনগণের সম্পদ লুট করে পুঁজিপতি শ্রেণির পকেট ভারি করতে গেলে কথা কাজের অসঙ্গতি এবং শেষ পর্যন্ত সর্বনাশা পরিণতি অপেক্ষা করতে থাকে। যদিও শেষ পর্যন্ত জনগণই সকল পরিণতির বোঝা বহন করতে বাধ্য হয়।

এখন অনেক আজগুবি কথা শোনা যাচ্ছে। আমরা নাকি দ্বিতীয় স্বাধীনতা পেয়েছি। কী বিচিত্র কথা! স্বাধীনতার এক ক্লাশ থেকে আরেক ক্লাশে উত্তরণ ঘটে? ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতার গণআকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি। সেই তাগিদ থেকেই বারে বারে গণবিস্ফোরণ হচ্ছে। এ বারও ব্যাপকতা নিয়ে তারই বিস্ফোরণ তথা গণ অভ্যুত্থান। ছাত্র সমাজ অগ্রণী অবস্থানে ছিল সামগ্রিকতায় না বুঝলে অন্ধের হাতি দেখার মতো হবে। এবং উগ্রতা, অরাজকতা, সমন্বয়হীনতা, জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতাহীনতা গণবিচ্ছিন্নতা ঘিরে আসবে। যা আবারও একটা বড় আত্মত্যাগের সাফল্যকে ম্লান করে দিতে পারে। যার আলামত চারিদিকে উঁকি দিচ্ছে। কমরেড হাবিব উল্যা চৌধুরী ও মমতাজ বেগম দুজনই আমরা যখন ১৯৮০ সালে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ গড়ে তুলি তার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। তাদের সততার আরেকটা দিক উল্লেখ করা যেতে পারে। হাবিব উল্যা চৌধুরী এক পর্যায়ে বললেন, দেখ যে দলটি আমরা গড়ে তুলেছি তা গতানুগতিক কোন দল নয়। এর দায়িত্ব পালনের গুরুভার আমার জানা আছে। কিন্তু আমাদের অবস্থান তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হচ্ছে না। সেজন্য আমি সাংগঠনিক দায়িত্বে থাকছি না তবে সর্বান্তকরণে এ দল লক্ষ্য পূরণে এগিয়ে যাবে সে কামনা ও প্রত্যাশায় থাকবো। যদি কখনও আমার দ্বারা সামান্য কিছু দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয়, আমাকে জানালে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। এই মহাপ্রাণ দুজন মানুষের সঙ্গে আমৃত্যু আমার এবং দলের যোগাযোগ ছিল। তার স্বহস্তে রান্না করা খাবার সযত্নে খাওয়ানোর স্মৃতি আজও আমাকে স্মৃতিকাতর করে। কমরেড হাবিব উল্যা চৌধুরী, মমতাজ বেগম লাল সালাম।

কমরেড রাজ্জাকের উপর হামলার প্রতিবাদ

১৪ পৃষ্ঠার পর

সংস্কৃতি তুলে ধরেছে। একই সময় এ মেধাগত সম্পদ সৃষ্টিতে যে মহান মানুষেরা ভূমিকা রেখেছেন এবং যাদের জীবন ও এক সাগর রক্তের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন হয়েছে সে সব বীর যোদ্ধাদের আপমান করছে, তাদের প্রতিকৃতিতে কালি লেপন করছে, ভাস্কর্য ভাঙচুর করছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেগম রোকেয়ার প্রতিকৃতিতে কালি লেপন করে বিকৃত করা হয়েছে। কিন্তু প্রশাসন নীরব! তারা কোন ভূমিকা পালন করেছে না! কুমিল্ল সার্কিট হাউজের সামনে বিভিন্ন মনীষীর প্রতিকৃতি আঁকা রয়েছে, ভাস্কর্য রয়েছে। সে সকল প্রতিকৃতিতেও কালি লেপন করা হয়েছে। এগুলো কারা করে? যারা নারী শিক্ষার বিরোধী, নারীর অগ্রযাত্রাকে ব্যহত করতে চায় এরা করেছে। যারা প্রগতিশীল মুক্তচিন্তা বিরোধী–ধর্মান্ধ কূপমণ্ডুক শক্তি তারা করেছে।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে মহান '৭১-র মুক্তিযুদ্ধের, '৯০ ও '২৪ এর অভ্যুত্থানের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চেতনায় গণঐক্য সৃষ্টির মাধ্যমে উগ্র জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা সৃষ্টিকারী শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য, সংগীত রক্ষা করতে হবে। এর পরিপন্থি শক্তিকে মানুষ প্রতিহত করছে। একই সাথে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চেতনায় গণ ঐক্যকে এগিয়ে নেওয়া এবং হামলাকারী, সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টিকারী, নারীবিদ্বেষীদের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়।

বাম জোট, সিপিবি ও বাসদের সমাবেশে হামলাকারীদের গ্রেপ্তার করুন, পত্রিকা অফিসে হামলা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিন

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করুন

জনজীবনের নিরাপত্তা ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের দাবি

বাম গণতান্ত্রিক জোট

বামজোট, সিপিবি, বাসদের সমাবেশে হামলাকারীদের গ্রেপ্তার, সংবাদপত্র অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ, জনজীবনের নিরাপত্তা ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের দাবিতে বাম গণতান্ত্রিক জোটের উদ্যোগে ২৬ নভেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

জোটের সমন্বয়ক ও বাসদ (মার্কসবাদী)-এর কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক মাসুদ রানার সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজ, সিপিবির প্রেসিডিয়াম সদস্য সাজ্জাদ জহির চন্দন, বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক আবদুস সাত্তার, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টির কেন্দ্রীয় সদস্য রুবেল শিকদার। সমাবেশ পরিচালনা করেন বাসদ (মার্কসবাদী) দলের নির্বাহী ফোরামের সদস্য সীমা দত্ত।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, বামজোট, সিপিবি, বাসদ, ছাত্র ইউনিয়নের সমাবেশে যথাক্রমে শরীয়তপুর, তেতুলিয়া, গাজীপুর ও জামালপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, বিএনপি, জামায়াতের লোকজনের নাম নিয়ে হামলার করেছে। *দৈনিক প্রথম আলো* ও *ডেইলি স্টার* পত্রিকা অফিসে হামলা করেছে। ভিন্ন মত-পথের দল, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানকে পুরনো ফ্যাসিবাদী কায়দায় হামলা-আক্রমণ করা গণ অভ্যুত্থানের চেতনা পরিপন্থি। এইসব হামলার সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, যে ছাত্র-তরুণরা জীবনবাজি রেখে ঐক্যবদ্ধভাবে ফ্যাসিবাদী হাসিনার পতনে লড়াই করেছে, তাদের নিজেদের মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষে ঘটনা খুবই উদ্বেগজনক। নেতৃবৃন্দ দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে বাজার সিন্ডিকেট ভেঙে দেওয়াসহ সর্বজনীন রেশনিং ব্যবস্থা চালু ও জনগণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানান।

নেতৃবৃন্দ বলেন, এই সময়ে চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে গ্রেপ্তার করা নিয়ে যে সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, সেটা কাম্য হতে পারে না। কোনভাবেই সাম্প্রদায়িক সহিংসতার দিকে যাতে এটা না এগোয় সে ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার জন্য তারা সরকারকে আহবান জানান।

নেতৃবৃন্দ দেশের আপামর জনগণকে জুলাই গণ অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থি যে কোনো ঘটনার বিরুদ্ধে সোচ্চার থেকে একটা পূর্ণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের লড়াইকে এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানান।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা কর, উন্মাদনা ও উসকানি রুখে দাঁড়াও

বাম গণতান্ত্রিক জোট, ফ্যাসিবাদ বিরোধী বাম মোর্চা ও বাংলাদেশ জাসদ

চট্টগ্রামে আইনজীবী হত্যার বিচার দাবি

বাম গণতান্ত্রিক জোট, ফ্যাসিবাদ বিরোধী বাম মোর্চা ও বাংলাদেশ জাসদের উদ্যোগে ২৭ নভেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক মাসুদ রানার সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন রুহিন হোসেন প্রিন্স, নাজমুল হক প্রধান, নাসিরুদ্দিন আহমেদ নাসু, বেলাল চৌধুরী। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন সিপিবির সভাপতি শাহ আলম, বাসদের সহকারী সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতনসহ জোটের নেতৃবৃন্দ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, ২৬ নভেম্বর চট্টগ্রাম আদালতে একজন আইনজীবীকে হত্যা করা হয় আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই। একইসাথে দ্রুত তদন্তের মাধ্যমে হত্যাকারীদের গ্রেপ্তা ও বিচারের দাবি জানাচ্ছি।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ২৬ নভেম্বর চট্টগ্রামের সংঘর্ষ উদ্বেগজনক। আমরা দেখছি যে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু মানুষ হিন্দু ও মুসলমানে বিভক্ত হয়ে পড়ছেন এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক বক্তব্য রাখছেন। এই প্রচারের বিরুদ্ধে সকল সচেতন মানুষকে রুখে দাঁড়াতে হবে। এই জুলাই অভ্যুত্থান স্বাধীনতা সংগ্রামসহ যেকোন দুর্যোগে-বিপদে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে প্রাণ দিয়েছেন, সমস্যা মোকাবিলা করেছেন। আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম, গণ অভ্যুত্থানসমূহ, সকল দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ছিল সম্মিলত সংগ্রাম। মানুষ এখনও লড়াই করছে একটা গণতান্ত্রিক ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশের জন্য। তাদের রক্তের দাগ এখনও মুছে যায়নি। তারা এই ধরনের বিভক্তি ও বিদ্বেষের বাংলাদেশ দেখতে জীবনদান করেননি। ফলে সামাজিক ঐক্য গড়ে তুলতে হবে।

সরকারের নাজুক ভূমিকার কারণে পরাজিত শক্তিগুলো বিভিন্ন ঘটনার সুযোগ নিতে পারছে। অভ্যুত্থানকারী শক্তিগুলোর সাথে মতবিনিময় করা, ঐক্য সৃষ্টি করার বিপরীতে আমলাতান্ত্রিক পথে রাষ্ট্র পরিচালনা করার পথে তারা এগিয়েছেন। উগ্র মৌলবাদীশক্তি বিভিন্ন কার্যকলাপকেও তারা থামাতে পারেননি। যে সতর্কতা নিয়ে এই সকল বিষয় সমাধান করা দরকার ছিল, তা করতে এই সরকার ব্যর্থ হয়েছেন। মানুষের সকল প্রকার নিরাপত্তার দায়িত্ব সরকারের।

নেতৃবৃন্দ জনগণকে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং উন্মাদনা ও উস্কানি রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

পরিবহণে হাফ ভাড়া আন্দোলনে বিজয়

ঝিনাইদহ

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ঝিনাইদহ জেলা শাখার উদ্যোগে গণপরিবহনে হাফ ভাড়া নিশ্চিত করার দাবিতে আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১০ নভেম্বর থেকে আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনে যুক্ত হয় জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা। দাবির যৌক্তিকতা তুলে ধরে ছাত্র ফ্রন্ট জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি প্রদান, ছাত্র সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলসহ নানা কর্মসূচি পালন করে। ছাত্র ফ্রন্টের পক্ষ থেকে ৩ দফা দাবি তুলে ধরা হয়। দাবিগুলো হলো ১. বাস-ট্রেনসহ সকল গণপরিবহনে শিক্ষার্থীদের হাফ ভাড়া নিশ্চিত করা; ২. হাফ ভাড়ার সময়কাল সকাল ৬টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত কার্যকর করতে হবে; ৩. সরকারি ছুটিসহ সপ্তাহে সাত দিনই শিক্ষার্থীদের হাফ ভাড়া কার্যকর করতে হবে।

আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ২০ নভেম্বর '২৪ জেলা প্রশাসক, বাস মালিক সমিতি এবং ছাত্র ফ্রন্ট ঝিনাইদহ জেলা শাখার আহ্বায়ক শারমিন সুলতানা, সদস্য নুসরাত জাহান সাথী, আফসানা আক্তার মিম, মো. সৌরভ হোসেন, মো. শাহীন খান শুভসহ নেতৃবৃন্দের সাথে যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রশাসন ও বাস মালিক সমিতি দাবি মেনে নেয় এবং ২৪ নভেম্বর '২৪ থেকে তা কার্যকর হয়। দাবি আদায়ে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের জন্য ছাত্র ফ্রন্ট জেলার নেতৃবৃন্দ অভিনন্দন জানিয়েছেন। নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, শিক্ষার সর্বজনীন অধিকার, শিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রকে বহন করাসহ ছাত্রদের ন্যায়সঙ্গত দাবি নিয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে আগামী দিনে আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

সংস্কার প্রস্তাব : নির্বাচন ব্যবস্থা

নির্বাচন সংস্কার কমিশনে বাসদের প্রস্তাব

১৬ পৃষ্ঠার পর

বাহিনীর জন্য আইন ও বিধান রচনা করতে হবে। পুলিশ, র‍্যাব বা বিজিবি সদস্য যাদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এবং অভিযোগ রয়েছে তাদেরকে নির্বাচন ডিউটি পালনে নিয়োগ করা যাবে না।

(ঙ) নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা ও গ্যাজেট প্রকাশ পর্যন্ত পুরো সময়ে নির্বাচনী কাজে নিয়োজিত সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীসহ সকলকে নির্বাচন কমিশনের অধীনে ন্যাস্ত করতে হবে। নির্বাচনী কাজে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি কোন প্রকার অন্যায়, অনিয়ম বা অপরাধ করলে কমিশন তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে এমন বিধান যুক্ত করা।

(চ) নির্বাচনী আইন, বিধি ও আচরণবিধি লঙ্ঘনের জন্য প্রার্থীতা বাতিল এবং জরিমানা, কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনকে দিতে হবে।

(ছ) প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় (পোস্টার, লিফলেট, জনসভা, মাইক প্রচার ইত্যাদি) কমিশন কর্তৃক বহন করার বিধান রাখা।

৫। নির্বাচনে প্রার্থীর যোগ্যতা :

(ক) নির্বাচনে প্রার্থী হতে চাইলে তার নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের সম্পদের বিবরণ সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে জমা দিতে হবে।

(খ) আয়ের সাথে সংগতিহীন স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির সন্ধান পেলে তা বাজেয়াপ্ত করা এবং প্রার্থীতার অযোগ্য ঘোষণা করতে হবে।

(গ) ঋণ খেলাপি হলে, বিদেশে নিজ নামে, স্বামী/ স্ত্রী, সন্তান-সন্ততির নামে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি থাকলে, কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মালিকানা-কর্তৃত্ব হস্তান্তর কার্যকরভাবে না করলে প্রার্থী যোগ্যতা হারাবে।

(ঘ) সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা, ধর্মীয় প্রচারণা কিংবা নির্বাচনী স্বার্থ সিদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড, ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডিত কিংবা স্থানীয় জনগণের কাছে অপরাধমূলক কাজে জড়িত থাকার বহুল আলোচিত কিংবা সুনির্দিষ্ট প্রমাণ থাকলে প্রার্থী যোগ্যতা থাকবে না। বিদেশী নাগরিক হলেও প্রার্থী যোগ্যতা থাকবে না।

(ঙ) নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি থাকাকালীন সময়ে নির্বাচনী এলাকার বাইরে স্থাবর-অবস্থাবর সম্পত্তি করে থাকলে তা বাজেয়াপ্ত করা যাবে এবং ভবিষ্যৎ প্রার্থীতার অযোগ্য ঘোষণা করা যাবে।

(চ) সাংসদসহ জনপ্রতিনিধিদের নিজস্ব নির্বাচনী এলাকার বাইরে রাষ্ট্রীয়ভাবে জমি বা সম্পদ বরাদ্দ করা যাবে না। এলাকায় ভাল জীবনযাপন স্বার্থে অনুরূপ বরাদ্দ করা যাবে। এতে সারা জীবন তারা ভোটারদের সান্নিধ্য ও শ্রদ্ধা পাবেন এবং সেবা নিতে বা দিয়ে যেতে পারবেন। নির্বাচিত প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রের কর্মচারীরা বিদেশে চিকিৎসা নিতে বা সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতে পারবেন না। তাতে দেশের শিক্ষা ও চিকিৎসা মানের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হবে।

৬। সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা, যাতায়াত ব্যবস্থা ও অতীত নির্বাচনী অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করলে ভাল হবে বলে আমরা মনে করি।

৭। ইভিএম প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত এমন নিশ্চিত প্রমাণ মিলেছে বলে আমাদের জানা নেই। আমেরিকার নির্বাচনে অতি আধুনিক পদ্ধতির মধ্যেও কারচুপির বিষয় সারা দুনিয়ার মানুষকে চিন্তিত করেছিল। আসল কথা হলো গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও সত্যিকারের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা।

৮। কোন সংসদ সদস্য ৩০ দিনের অধিক কার্যদিবস অনুপস্থিত থাকলে অথবা জনস্বার্থের বিপরীতে অবস্থান নিলে তাহার সদস্যপদ জনগণ রিকল (প্রত্যাহার) করতে পারবেন এমন বিধান করতে হবে। অনুপস্থিত সময়কালে তারা কোন আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন না।

৯। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার ৩০ দিন পূর্বেই নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হবে এবং নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার সাথে সাথে পূর্ববর্তী নির্বাচিত প্রতিনিধি অব্যাহতি পেয়েছেন বলে গণ্য করতে হবে।

১০। যেহেতু দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে বলে জনমনে আস্থা নেই, ফলে সুষ্ঠু-অবাধ-নিরপেক্ষ অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য দল নিরপেক্ষ তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠান এর বিধান আরও কয়েক টার্ম রাখা জরুরি বলে মনে করি।

১১। পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা।

১২। ভোট কেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা। গণমাধ্যম কর্মীদের প্রবেশে এবং সংবাদ সংগ্রহে সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করা।

পরিশেষে বলতে চাই, আগেও বলেছি নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার বা পরিমার্জন করার কাজটি রাজনৈতিক, ফলে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে আলোচনা করে বোঝাপড়া তৈরি ও ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করেই সবার সম্মতিতে নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কারের একটি রূপরেখা বা প্রস্তাবনা সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে তুলে ধরতে পারে। যা পরবর্তী নির্বাচিত রাজনৈতিক সরকার বাস্তবায়ন করবে।

ভারতে বাংলাদেশের দূতাবাসে হামলা ও জাতীয় পতাকা অবমাননাকারীদের শাস্তি দাও

শেষ পৃষ্ঠার পর

সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, সিপিবির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টির সদস্য রুবেল শিকদার।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে ভারতের মাটিতে বাংলাদেশের হাইকমিশন অর্থাৎ কূটনীতিক স্থানের নিরাপত্তার দায়িত্ব ভারত সরকারের। তারা সেটি দিতে ব্যর্থ হয়েছে অথবা হামলার সুযোগ করে দিয়েছে। আমরা এই ব্যর্থতা ও হামলার নিন্দা জানাই। এটা শুধু স্থাপনা বা হাইকমিশনের ওপর হামলা না, এটা দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা নেতিবাচক মনোভাবের প্রকাশ যা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ককে দুর্বল করে। এর পেছনে গভীর ষড়যন্ত্র থাকতে পারে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, আমাদের দেশে ফ্যাসিস্ট সরকার উৎখাত হয়েছে ৫ আগস্ট। সেই সরকারকে মদদ দিয়েছিল ভারত সরকার। এখন সেই সরকারের প্রধান পালিয়ে যাওয়া শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দিয়েছে তারা। একারণে ভারত সরকার শেখ হাসিনার পরাজয়ের মধ্যে মোদির পরাজয় দেখছে, কূটনীতির ব্যর্থতা দেখছে। যার কারণে ভারতের শাসকরা বাংলাদেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করতে তৎপর। যা আমাদের সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি। পশ্চিম বঙ্গের বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী উসকানিমূলক বক্তব্য দিয়ে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে, মিথ্যা অপপ্রচার করছে, হুমকি দিচ্ছে। এটা তাদের ভোটের রাজনীতির নোংরা খেলা। তার থেকে আরও এককাঠি বাড়িয়ে পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী কথিত সংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগ এনে বাংলাদেশে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়নের জন্য কেন্দ্রে চিঠি দেওয়ার কথা বলেছেন। আমরা তার বক্তব্যের নিন্দা জানাই এবং তা প্রত্যাহারের দাবি জানাই।

ভারতের গণমাধ্যমও অতিরঞ্জিত মিথ্যা তথ্য ও বানোয়াট খবর প্রচার করছে। ভারতের বুর্জোয়া দলগুলো বাংলাদেশের অভ্যান্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে, অতি বাড়াবাড়ি করে তাদের ভোটের রাজনীতির ফায়দা তোলার অস্ত্র বানাচ্ছে। যা কোনভাবেই কাম্য নয়। সেখানকার বামপন্থি দলগুলো এর বিরোধিতা করে উভয় দেশের শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন গড়ার চেষ্টা করছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দিল্লিতে বাংলাদেশ দূতাবাস ছাড়াও ত্রিপুরা, আসাম, মুম্বাই ও চেন্নাইতে বাংলাদেশের উপ ও সহকারী হাইকমিশন রয়েছে। পাঁচটি মিশনের মধ্যে তিনটি ইতিমধ্যে হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের কিছু উগ্র জাতীয়তাবাদী ও মৌলবাদী শক্তি ভারতের জাতীয় পতাকাকে অপমান করছে আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই এবং আমাদের সরকারের প্রতি আহবান জানাই এদের গ্রেপ্তার ও বিচার করুন। যারা আমাদের দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। বাংলাদেশের ইতিহাস হচ্ছে এখানে মানুষ কোন উগ্র মৌলবাদী শক্তিকে বরদাস্ত করে না।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, ৫ আগস্ট ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানের পর দেশে সংখ্যালঘুদের স্থাপনায় যেমন হামলা হয়েছে তেমনি মাজার, আখড়া, ভাস্কর্য ভাঙা হয়েছে যা বৈষম্যবিরোধী চেতনার গণ অভ্যুত্থানের জন্য হুমকি।

নেতৃবৃন্দ বলেন, অভ্যুত্থান পরবর্তী কিছু ঘটনা যে ঘটেছে, সেখানে তিন ধরনের শক্তির ভূমিকা ছিল। একটা হচ্ছে সুযোগসন্ধানী শক্তি, যারা কোনকিছু ঘটলেই সেখান থেকে সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করে। আরেকটি হচ্ছে, পতিত ফ্যাসিস্ট শক্তি, যারা গণ অভ্যুত্থানের পর দেশে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন চলছে—এটা প্রমাণ করতে চায়। তারা এই ঘৃণ্য উদ্দেশ্য নিয়ে মাঠে নেমেছিল। তৃতীয়ত, উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তি, যারা সুযোগ পেলেই এ ধরনের কর্মকাণ্ড ঘটায়।

নেতৃবৃন্দ দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান এবং ভারত সরকার দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখবে প্রত্যাশা করেন।

মন্ত্রী-সচিব, পরামর্শক, উপদেষ্টাসহ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে দুর্নীতি ও লুণ্ঠনে জড়িতদের বিচার দাবি

১৭ পৃষ্ঠার পর

(এলএনজি) কেনা ও এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের চুক্তির সময় তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস উপস্থিত ছিলেন। এখন ওই কোম্পানির উপদেষ্টা হয়ে পিটার হাস বাংলাদেশে ঘুরছেন নতুন করে কাজ পেতে। দেশের সম্পদের শতভাগ মালিকানা নিশ্চিত করতে হবে। জাতীয় সক্ষমতা বাড়াতে হবে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, ব্যবস্থা না বদলালে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। তাই ব্যবস্থা বদলের রাজনীতি জোরদার করতে হবে। কোন জায়গায় সংস্কার করলে ব্যবস্থা বদল হবে, সেটা বুঝতে হবে সরকারের। 'দায়মুক্তি' আইনের অধীনে যেসব দুর্নীতি হয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। মানুষের মূল দাবি, সস্তায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সরবরাহ। গণশুনানির মাধ্যমে এসবের দাম নির্ধারণ করতে হবে।

বিদ্যুৎ খাতে দ্রুত সময়ে টাকা সাশ্রয়ের সুযোগ আছে। ৪০টি ফার্নেস তেলভিত্তিক কেন্দ্র বাতিল ও ৮টি গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কেন্দ্র ভাড়া ডলারের বদলে টাকায় হিসাব করে ২০ হাজার কোটি টাকা কমানো যায় ২৪ ঘণ্টায়। বিগত সরকারের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, সাবেক বিদ্যুৎ-সচিব আহমদ কায়কাউস, আবুল কালাম আজাদ ও মনোয়ার হোসেনরা জ্বালানি অপরাধী। আগের সরকারকে মুমূর্ষু অবস্থায় আইএমএফ ঋণ দিয়েছে। এই সরকার সেই ঋণের দায় পরিশোধে অঙ্গীকৃতি জানাতে পারে। এমন ঘটনা ইকুয়েডরে আছে। এ সরকারও নতুন করে সংস্কারের জন্য আইএমএফ থেকে ঋণ নিচ্ছে। তার আগে সংস্কারের রূপরেখা তৈরি করতে হবে। না হলে ঋণ কাজে আসবে না।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বেসরকারি খাতকে উৎসাহী করা, বিদ্যুৎ উৎপাদন না করে ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রকে টাকা দেওয়া, এলএনজি আমদানি, বিদ্যুতের দাম ১৪ বার বাড়ানো, উৎপাদন না করেও কেন্দ্র ভাড়া দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে গত ১৫ বছরে। ঋণনির্ভর প্রকল্প নিয়েছে। এসব চালিয়ে যেতে জনস্বার্থবিরোধী আইন করা হয়েছে।

জাতীয় কমিটির ৬ দফা দাবির প্রতিটির মধ্যে আলাদা করে বেশ কিছু প্রস্তাব তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির মূল্য কমাতে স্বল্প মেয়াদে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া; বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকে অন্যায্য কেন্দ্র ভাড়া (ক্যাপাসিটি চার্জ) প্রদানে ভর্তুকি বন্ধ করে মূল্যবৃদ্ধির চাপ কমাতে হবে; রূপপুর, মাতারবাড়ী, রামপাল ও পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ বিভিন্ন প্রকল্পের অনিয়ম ও চুক্তি পর্যালোচনা করে বাতিল বা সংশোধনের ব্যবস্থা নেওয়া; রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র বাতিল করা; পল্লী বিদ্যুতের সংকট আইনি প্রক্রিয়ায় সমাধান করা; দেশীয় গ্যাস উত্তোলন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে আমদানি নির্ভরতা কমানো; সমুদ্রে গ্যাস উত্তোলনে বাপেক্সের সক্ষমতা বৃদ্ধি; নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করে প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র নিশ্চিত করা এবং সৌরবিদ্যুতের যন্ত্রপাতি আমদানিতে শুল্ক প্রত্যাহার করা। এই সরকারকে জনগণ সমর্থন দিয়েছে তাই তাদের প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে।

MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড

● বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র
● ডিসেম্বর-জানুয়ারি ২০২৫
● ২৩/২ তোপখানা রোড (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১০০০। ফোন : ০২ ৪১০৫৩৬৪৪
● Website : www.spb.org.bd

রংপুরে কৃষক-খেতমজুর ও আদিবাসী সমাবেশ অনুষ্ঠিত :

সারা বছর কাজ-খাদ্য ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন প্রতিষ্ঠার দাবি

জুলাই-আগস্ট হত্যাকাণ্ডের দ্রুত বিচার, পাচারের টাকা উদ্ধার, অবৈধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে কৃষিখাতে বরাদ্দ, কৃষি উপকরণের দাম কমানো, ফসলের লাভজনক দাম নিশ্চিত, সরকারি উদ্যোগে হাটে হাটে ক্রয়কেন্দ্র খোলা, সিন্ডিকেট ভেঙে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা, গ্রাম-শহরের শ্রমজীবীদের রেশন, ভূমিহীনদের আবাসন ও আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের উদ্যোগে ২৭ অক্টোবর '২৪ রংপুর পাবলিক লাইব্রেরি মাঠে কৃষক, খেতমজুর ও আদিবাসী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশের আগে বিভিন্ন স্থান থেকে আসা কৃষক, খেতমজুর, আদিবাসী ও ভূমিহীনরা শহরের শাপলা চত্বরে জমায়েত হয়ে বিভিন্ন দাবি সম্বলিত ফেস্টুন লাল পতাকা নিয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়কে মিছিল করে পাবলিক লাইব্রেরি মাঠে মিলিত হয়। চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সংগীত ও নৃত্য পরিবেশনার পর বাসদের কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা জননেতা কমরেড খালেকুজ্জামান সমাবেশের উদ্‌বোধন করেন। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ও রংপুর জেলা বাসদের আহবায়ক কমরেড আব্দুল কুদ্দুসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য দেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, রংপুর পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান গণতন্ত্রী পার্টির সাবেক সভাপতি কমরেড মোহাম্মদ আফজাল হোসেন, সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি অধ্যক্ষ ওয়াজেদ পারভেজ, সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম রব্বানী, সদস্য ফুলবর রহমান, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বিমল খালকো, সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমটির সদস্য মমিনুল ইসলাম।

উদ্‌বোধনী বক্তব্যে কমরেড খালেকুজ্জামান

এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

ভারতে বাংলাদেশের দূতাবাসে হামলা ও জাতীয় পতাকা অবমাননাকারীদের শাস্তি দাবি

উভয় দেশের জনগণের ঐক্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় সোচ্চার হওয়ার আহ্বান

বাম গণতান্ত্রিক জোট

ভারতের আগরতলায় বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশনে হামলা-ভাঙচুর জাতীয় পতাকা পুড়িয়ে ফেলা এবং সাইনবোর্ড ভেঙে আগুন ধরিয়ে দেয়া, কলকাতা, মুম্বাই মিশনে হামলার প্রতিবাদে এবং উভয় দেশের জনগণের ঐক্য গড়ে তোলা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার দাবিতে ৪ ডিসেম্বর বাম গণতান্ত্রিক জোটের উদ্যোগে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

বাম জোটের সমন্বয়ক মাসুদ রানার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ

এরপর পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ১

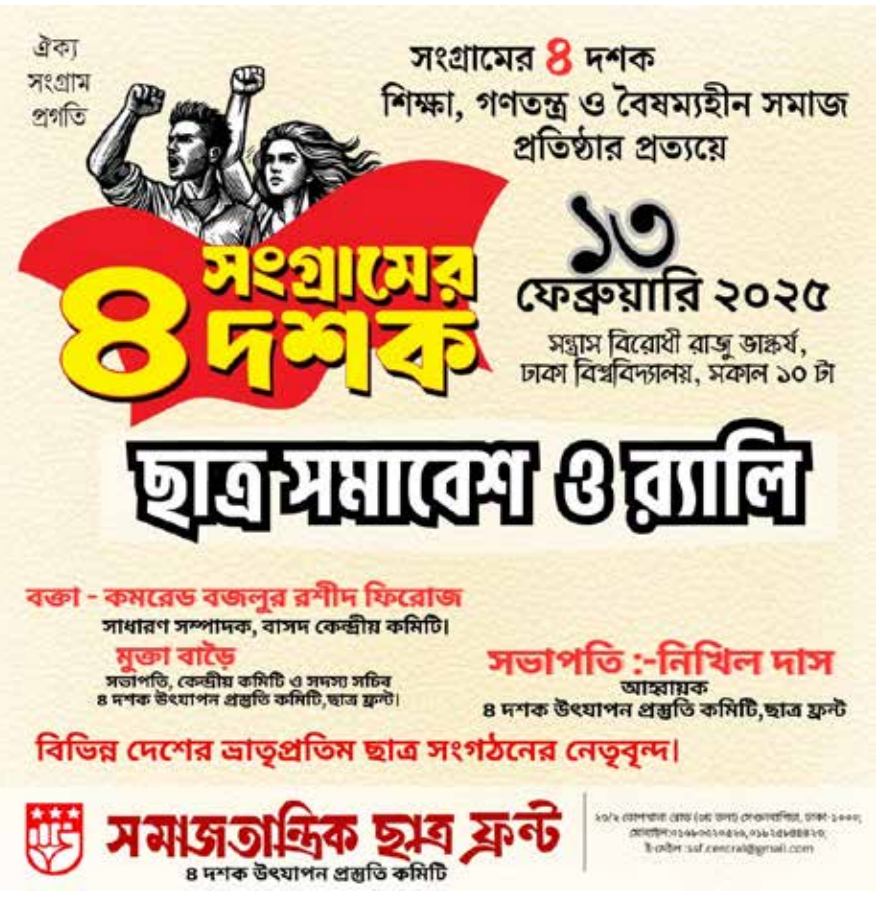

সম্পাদক : রাজেকুজ্জামান রতন। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে প্রকাশক : বজলুর রশীদ ফিরোজ কর্তৃক ২৩/২ তোপখানা রোড (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
সোনালী প্রিন্টিং প্রেস, ১৬৭ ইনার সার্কুলার রোড (ইডেন কমপ্লেক্স), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত। ফোন : ০২ ৪১০৫৩৬৪৪, ফ্যাক্স : ০২ ৪১০৫৩৬৪৪; E-mail : monthly.vanguard81@gmail.com